বুদ্ধদেব গুহ

আইবুড়ো
দুই বুড়োর গল্প

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

সুকবি তমালিকা পণ্ডা শেঠ
কল্যাণীয়াসু

আজ সকাল থেকেই মেঘ করে আছে। সুনামির পর থেকেই আন্দামানের আবহাওয়াটা মাঝে মাঝেই খামখেয়ালিপনা করছে। মানুষের মনের আতঙ্ক এখনও কাটেনি। আর কাটেনি, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মজা করার ঘোর।

যখন উত্তরাখণ্ডে কয়েক বছর আগে ভূমিকম্প হয়েছিল। হোটেলের লিফটটা এখনও সেই ভূমিকম্পর স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঠতে-নামতে দুলতে ও শব্দ করতে থাকে। পাঁচ বছর পরে গিয়ে দেখলাম। ভূমিকম্প হওয়ার আগে কেউ কল্পনাও করেনি যে গাড়োয়াল বা কুমায়ুঁতে ভূমিকম্প আদৌ হতে পারে।

পাহাড় ও সমুদ্র যুগযুগান্ত ধরে পৃথিবীর মানুষের নানারকম অত্যাচার ও উপদ্রব সহ্য করে এসেছে। তুমুল সর্বনাশ করার সুপ্ত ক্ষমতার হঠাৎই প্রকাশ করে কয়েক বছর আগের উত্তরাখণ্ডের সেই ভূমিকম্প এবং আন্দামানের সুনামি মানুষকে তাই হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছে তার ক্ষমতার প্রলয়ঙ্করী রকম।

আন্দামান উপসাগরের বুকের এই ছোট্ট দ্বীপের মধ্যের এই ছোট্ট বাংলোর বারান্দায় বসে ভোরবেলা নীলগিরি হিলস্-এর চা খাচ্ছিলাম। বিনা পয়সাতে পাচ্ছি, তাই খাচ্ছি, নইলে আমাদের দার্জিলিং-এর চা স্বাদেগন্ধে অনেকই ভাল। তবে দার্জিলিংও ক'টা দিন আমাদের আর থাকবে, তাও বলা যাচ্ছে না।

কচি ওঠেনি এখনও। আমার বিশ্বভ্রমী বন্ধু কচি মিত্তির এই প্রথমবার এসেছে আন্দামানে। তাই, স্বভাবতই খুবই উত্তেজিত। কালই এসেছে ফ্লাইটে। কলকাতা থেকে। আমি ওকে পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্টে রিসিভ করে আমার কোম্পানির মোটর বোটে করেই এই দ্বীপে নিয়ে এসেছি। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব ত্রিশ নটিক্যাল মাইল। দ্বীপের নাম স্যান্ডপাইপার। নামটি আমারই দেওয়া। প্রায় একাই থাকি। তবে একেবারে একা নই। জিতেন ঘোষ, একজন মাঝবয়সী পূর্ববঙ্গীয় মানুষও আছে। সেই আমার ম্যান-ফ্রাইডে। তবে, আছে আমার আসার আগে থেকে রান্না-বান্না-দেখা-শোনা, অসুখ হলে চিকিৎসা করা, সন্ধের পর ভূতের আর নানা পেত্নীর গল্প শোনানো, সপ্তাহে রিলিজিয়াসলি একদিন পোর্টব্লেয়ার বা রসস্ আইল্যান্ডে বোট বা ক্যাটামারন নিয়ে হাটবাজার করে আসা এই সবই জিতেনই করে। উদ্বাস্তু জিতেন নিজে নয়, জিতেনের বাবা এখানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন বহুদিন আগে। ওদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশালে। জিতেনের বাবা এসেছিলেন বরিশাল জেলার মাধবপাশা নামের এক গ্রাম থেকে। জিতেনের জন্ম অবশ্য পোর্ট ব্লেয়ারেই। ষাটের দশকে। ঠিক কোন বছরে জন্মেছিল তা জিতেনের মনে নেই। যে বছরে আন্দামানে প্রায় সুনামির মতো দুর্যোগ ঘটেছিল সেই বছরে। তার মায়ের কাছে শুনেছিল জিতেন।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পূর্ববাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দাবার গুটির মতো যে সব চাল চালা হয়েছিল তা

অমানবিক। দণ্ডকারণ্য এবং আন্দামান এই দুই-ই ছিল সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বাঙালিদের দেশকে ভালবাসার পুরস্কার। সেলুলার জেলের মধ্যে বন্দিদের যে তালিকা দেওয়ালে খোদাই করা আছে তা পড়লে দেখা যায় তাঁদের অধিকাংশই বাঙালি। অন্য ভাষাভাষী, বিশেষ করে পাঞ্জাবি এবং মারাঠিও কিছু ছিলেন কিন্তু সিংহভাগই বাঙালি। সেই তালিকা দেখে গর্বে যেমন বুক ভরে ওঠে, তেমন দুঃখ এবং লজ্জাও হয়। যে সব বাঙালি আন্দামানের সেলুলার জেল দেখেননি তাঁদের বলতে ইচ্ছে করে যে অন্য তীর্থে যাবার আগে ওই তীর্থে একবার ঘুরে আসুন। না গেলে, পাপ হবে।

তখন ভারতের পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী ছিলেন দিল্লিতে বি কে খান্না। পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের যতরকম সুযোগ-সুবিধা তিনি দিয়েছিলেন সেই তুলনাতে বাঙালি উদ্বাস্তুদের কিছুই দেননি। অত্যন্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিলেন।

কচির বাবা ছিলেন পাটনা হাই কোর্টের একজন নামকরা ব্যারিস্টার। ও বাবার একমাত্র সন্তান। হাজারিবাগের সেইন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ত কচি, তারপরে পাটনাতে কলেজ শেষ করে বিলেতে যায় ব্যারিস্টারি পড়তে। কিন্তু ফিরে পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস সিরিয়াসলি করেনি আদৌ। অথচ অত্যন্তই মেধাবী ছিল। আইনের উপর দখলও ছিল অসাধারণ। অনেকের কাছেই শুনেছি, অল ইন্ডিয়া রিপোর্টস খুঁজলে তরুণ ব্যারিস্টার কে এন মিত্তিরের সওয়াল করা অনেক রিপোর্টেড কেসই পাওয়া যাবে। কিন্তু ও অন্য দশজনের মতো আদৌ ছিল না। ও ছিল ভীষণ স্বাধীনচেতা ও জীবনবিলাসী।

কিছুই না করে বসে বসে খাওয়ার মধ্যে ও কোনও লজ্জাবোধ করত না। 'মজামে' দিন কাটাত ও। গান গাইত এবং শুনত, মাছ ধরত, শিকার করত। হিন্দিতে যাকে বলে 'মন মৌজী আদমি', ও ছিল তাই। বলত,

যাদের টাকার দরকার তারা কাজ করুক। বাবা যা রেখে গেছেন পাঁচ জীবনেও তা শেষ করতে পারব না।

আমার দাদুর ছোটোখাটো একটি কয়লা-খাদান ছিল ঘেটো-টাঁড়-এ। কিন্তু আমাদের আদি বাস ছিল গিরিডিতে। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে অভ্রর ব্যবসাতে প্রবল মন্দা আসতে বাবা গিরিডি ছেড়ে হাজারিবাগে চলে আসেন দাদুর সঙ্গে। স্বাস্থ্যকর জায়গা, পড়াশোনার জন্যে ভাল স্কুল-কলেজ আছে সেই জন্যে। অভ্র খাদান রাজঘড়িয়াদের কাছে বিক্রিবাটা করে হাজারিবাগে এসে খোঁজখবর করে হাজারিবাগ-রাঁচি রোডে রামগড়ের কাছে ঘেটো টাঁড়-এ একটি কয়লা খাদান নেন দাদু।

কচি, পাটনার বাড়ি থেকে তাদের হাজারিবাগের কানহারি রোডের সুন্দর বাড়িতে এসে প্রায়ই থাকত এবং চারদিকের জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত। তিলাইয়া ড্যামের রিজার্ভারে পরিযায়ী 'নাকটা' হাঁস আসত শীতে, তা শিকার করত এবং মাছ ধরত। মাছ ধরতে প্রায়ই চলে যেত তোপচাঁচি হ্রদেও, পরেশনাথ পাহাড়ের পায়ের কাছে। হ্রদের চতুর্দিকে ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড় এবং সেই জঙ্গলকে ঘিরে লালমাটির পথ ছিল। সেই জঙ্গলে চিতাবাঘও থাকত কখনও কখনও। কোটরা হরিণও। চিতাবাঘ জিপে বসেই মারত। চিতাবাঘের যাতায়াতের পথে পাঁঠা বেঁধে রেখে।

আমি তখন ঘেটো টাঁড়ে বাবার কয়লা খাদানে হাজারিবাগ থেকে যাওয়া-আসা করি। ম্যানেজারবাবু রামপিয়ারি পাঁড়েকে নানা কাজে সাহায্য করি। একশো ভাগ খাঁটি 'ইনসান' ছিলেন পাঁড়েজি। তখনও পুরো দেশটাই এমন চোরজোচ্চোর হয়ে যায়নি। মানুষ নিজের সততার জন্যে গর্বিত হতেন এবং সততা অনেকেই ক্ষেত্রে পুরস্কৃতও হত। আমি বা কচি যে—ভারতবর্ষে জন্মেছিলাম এবং বড় হয়েছিলাম সে এক অন্য

ভারতবর্ষ। কচি, হাজারিবাগে এলেই আমি যেখানেই থাকি আমাকে তুলে নিয়ে যেত ও, ওর বেন্টলি গাড়িতে বা জিপে করে নানা জঙ্গলে। টাটিঝরিয়া এবং টুটিলাওয়াতে ওর দুই চেলা ছিল ইজাহার আর ইফতিকার। কচি এলেই ওরাও এসে জুটত। হিন্দিতে বলে 'গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা মিলে এক'। ইজাহার এবং ইফতিকার সেরকমই চেলা ছিল।

—আয় কচি, চা ঠান্ডা হয়ে গেল। তোর জন্যে নতুন এক পট চা আনতে বলি।

তারপর বললাম, রাতে ঘুম ভাল হয়েছিল?

—প্রথম রাতে নতুন জায়গাতে ঘুম কারোরই হয় না। আজ রাত থেকে হবে হয়তো। তুই তো আমাকে আলাদা ঘর দিয়েইছিস শোবার জন্যে। ঘুম তো হবার কথা ছিলই।

--মানে?

--মানে, একা ঘরে পরস্ত্রী ছাড়া কারও সঙ্গেই আমি শুতে পারি না। এক খাটে দুজনে সারারাত কী করে যে ঘুমোয় স্বামী-স্ত্রীরা বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ তা আমি ভেবেই পাই না।

—ওই জন্যেই কি বিয়ে করলি না?

—সেটাও একটি কারণ বটে।

তারপরে কচি আমাকে বলল, তুইই বা করলি না কেন? বিয়ে?

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, বলতে পারিস ভয়ে।

—কিসের ভয়।

—আরে, সারা রাত পুটুর পুটুর করে কথা বলত পৃথিবীর সমস্ত মানডেন বিষয়ে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে...

—এটা বাজে কথা। এক সঙ্গে শুয়ে মেয়েরা কি শুধু কথাই বলে? আর কিছুই করে না?

—আর কী করবে? বাঙালি মেয়েরা কি পার্টিসিপেট করে? চিত হয়ে শুয়ে সিলিং-এ ঘুরন্ত ফ্যান অথবা স্থির হয়ে থাকা টিকটিকি দেখে। আর যাবতীয় কর্তব্য করতে হয় তার সঙ্গী পুরুষকেই।

—কর্তব্য মানে?

—মানে যাবতীয় কর্তব্য। নিজেকে উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত করে, তারপর স্ত্রীকে নানা প্রক্রিয়ায় জাগ্রত করে যা যা করার তা করতে হয়।

—ভাবছিস তাই। এ যুগের মেয়েরা অন্যরকম। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এর ছবি দেখে এবং সিডি-তে সফটপর্নো ছবি দেখে তারাই নাকি এখন অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

—তুই জানলি কী করে? তুই তো অক্ষত-লিঙ্গ খোকাবাবু—

—এরকমই শুনি। আমরা জীবনে অনেক কিছুই মিস করেছি। এখন পঁচাত্তর বছর বয়সে এসে মনে হয়।

—সেটা ঠিক।

—এই তো! তুই ব্যাচেলর হলে কী হয়? তুই তো এক নম্বরের সেক্সিট। প্রথম যৌবন থেকেই। এক্সপেরিয়েন্স না থাকলে তুই এত সব জানলি কী করে?

—সকালে উঠেই একটা বস্তাপচা বিষয় নিয়ে ভ্যাজর ভ্যাজর শুরু করলি। এখন বল, ব্রেকফাস্টের পর মাছ ধরতে যাবি কি না। তোর লাইন, ফিশিং রড এবং ফ্লোটটোট সব এনেছিস তো? এই সমুদ্রের মাছ তো আর পুকুরের পুঁটি মাছ নয়।

—জানি।

—চান করে ব্রেকফাস্ট খাবি? নাকি সূর্যাস্তর আগে ফিরে এসে শাওয়ারে চান করবি? তার পরেই খাওয়া।

—ধুসস্! সমুদ্রপারে এসে চানঘরে চান করে কোন গাধারা?

—সমুদ্রপার মাত্রেই তো আর ভাল বিচ নেই। আমার এই

স্যান্ডপাইপার দ্বীপে অবশ্য আছে একফালি ভাল বিচ। যদিও আন্দামানে চান করার ভাল বিচের অভাব।

—ওতেই হবে। হাঙরে যন্ত্রপাতি কেটে নেবে না তো?

—এখন নিলেই বা কী? যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তো ফুরিয়েই এসেছে প্রায়। তোর বয়স কত হল?

—আমি তো তোরই বয়সী। ক'মাসের ছোটবড়। আমার ছিয়াত্তর হবে এ মাসেই। আগামী পূর্ণিমাতে।

—বাঃ। জমিয়ে তোর জন্মদিনের পার্টি করতে হবে।

—ছাড় তো। আমার আবার জন্মদিন! জন্মদিন বা মৃত্যুদিনও কোনও ঘটনাই নয়। আমরা আম-জনতা। ঘেঁটুফুলের মতো ফুটি, ঘেঁটুফুলের মতো ঝরে যাই।

—ব্রেকফাস্টে কী খাবি?

—যা খাওয়াবি।

—হেভি ব্রেকফাস্ট করে নে। লাঞ্চ তো নেই। একেবারে সেই ডিনার। তবে কিছু বিয়ার আর স্যান্ডউইচ নিয়ে নেব।

—কীসের স্যান্ডউইচ?

—সুরমেই মাছের। বিয়ার এখানে ফ্ল্যাট হয়ে যায়। কলকাতা থেকে এম ভি হর্ষবর্ধনে করে আসে তো। তারপরেও এখানে কতদিন পড়ে থাকে। আমার বোটে তো আর ফ্রিজ নেই। আমার এখানেও নেই। খেপলা জালের মধ্যে দিয়ে আমরা জলে ডুবিয়ে রাখি। তাও বেলা বাড়লে সমুদ্রের জলও গরম হয়ে যায়।

—তা হলে বিয়ার নিস না। এক বোতল ভোদকাই নিয়ে চল।

—তা নেওয়া যেতে পারে। রাশ্যান 'অ্যাবসলুট' ভোদকা নেব? না, একটা নতুন ভোদকা দিয়েছেন অ্যাডমিরাল ভোরা, সেটা নেব? আমি

খাইনি কোনওদিন। এখানে এমনিতে আমি টিটোটালারই। তোর মতো কেউ এলে-টেলে কম্পানি দিই।

—কী নাম?

—কার?

—আঃ তোর ভীমরতি ধরেছে।

—ধরতে তো পারেই। বয়স তো হলই।

—নামটা? কী যেন গুজ? মনে পড়েছে। গ্রে গুজ।

—মানে, রাজহাঁস?

—হ্যাঁ। ফরাসি ভোদকা।

—আমার কাছে বিটার্স আছে। অ্যাঙ্গুস্টুরা বিটার্স।

—বাবাঃ। আন্দামানের এই অখ্যাত দ্বীরে তোর আয়োজন তো অনেক। একেবারে জমে যাবে।

তারপরেই বললাম, কচি, তোর মনে পড়ে? তিনপাহাড়ের কাছে শীতের গঙ্গায় সারাদিন দাঁড় বাওয়া নৌকাতে করে ঘুরে ঘুরে আমরা নদীর চরে একবার রাজহাঁস মেরেছিলাম। ফ্লাইং। তাদের রংও কিন্তু ছিল ছাই। গ্রে-গুজ।

—তা ঠিক। তবে তা ছিল ইন্ডিয়ান গ্রে-গুজ আর এই ভোদকা হল ফ্রেঞ্চ গ্রে-গুজ।

—তা ঠিক।

—মাছ ধরতেই যদি যাবি তাহলে চা খেয়ে বাথরুম ঘুরে আয় তারপর ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব। এই মাঝ পাহাড় থেকে নেমে জেটিতে পৌঁছতেও তো সময় লাগবে।

—তা তো লাগবেই।

অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত ক্যাটাম্যাবনটা না নিযে মোটর বোটটাই নিয়েছিলাম। কচিব ক্যাটাম্যাবনে চডার অভ্যেস নেই। কোনও বড় মাছ হঠাৎ বদমাইসি করে ধাক্কা-টাক্কা মাবলে ক্যাটাম্যারন উল্টেও যেতে পাবে। তাছাড়া, কচির আনা আমেরিকান লাইন ও বড হুইল অনায়াসে ব্যবহার করারও অসুবিধে ছিল ক্যাটাম্যারনে চড়ে।

আমাদের সঙ্গে 'জেটি' অবধি জিতেনও এসেছিল। তেল-টেল সব দেখেই রাখে বোট এবং ক্যাটাম্যারনের। এবং মোবিলও। কখন যে বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন হয় এবং আবহাওয়ার খামখোলিপনাতে ফেরাই বা কখন হবে তা কে বলতে পারে।

রাতে কী রাঁধুম ছার?

জিতেন বলল।

কচিবাবুকে জিগগেস করো।

আরে আমি কী বলব। পাশেই তো আর গড়িয়াহাটের বাজার নেই যে যা বলব তাই রেঁধে দেবে। এখানে যা সহজে পাওয়া যায় তাই রেঁধে রাখো।

—কাঁকড়া খান কি ছার?

শুধু খাইই না, খুব ভালবেসে খাই।

কচ্ছপের ডিম খান? মাংস?

—পাই কোথায়? তাছাড়া, মানেকা গান্ধী জানলে তো এই বুড়ো বয়সে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেবেন।

মানেকা গান্ধীর প্রভাব সুদূর বিস্তৃত। গত পাঁচ সাত বছর মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অভয়ারণ্যে ঘোরবার সুযোগ হয়েছিল। নাগপুরের প্রদীপ গাঙ্গুলি, প্রদীপ মৈত্র ইত্যাদিদের সহযোগিতাতে। মহারাষ্ট্রের বনমন্ত্রী কট্টর নিরামিষাশী তাই মহারাষ্ট্রের সব জঙ্গলেই আমিষের প্রবেশ নিষেধ।

তাই? কচি বলল। এটা অন্যায়। এগুলো সব ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারও উপরেই জোর করে নিজের মত চাপানো উচিত নয়।

তা ঠিক।

সুইফটলেট পাখির রোস্ট করব?

জিতেন বলল।

সেটা আবার কী পাখি?

পরে বলব তোকে। এই পাখির বাসা দিয়েই তো বার্ডস-নেস্টস স্যুপ হয়। বিখ্যাত চাইনিজ ডিশ।

তা জানি। কিন্তু কখনও খাইনি।

এবারে তোকে খাওয়াব। এই পাখির বাসা আমরা রফতানি করি। মেইনল্যান্ড চায়নাতে যেমন করি তেমন মিয়ানমারেও করি, মানে আগের বার্মা, শরৎবাবুর 'পথের দাবী'র বর্মা দেশ।

তারপরই বললাম, চল প্রায় দশটা বাজে। বেরিয়ে পড়ি এবারে।

—রাতে ভাত খাইবেন তো? না রুটি করুম?

জিতেন কথা কেটে বলে উঠল।

—না না। ভাতই খাব। প্রায় দেড়মাস ভাত খাই না।

—তবে ভাতই করুম অনে।

—আমি, কচি আর জিতেনের দীর্ঘায়িত কথোপকথনকে হ্রস্ব করে এঞ্জিন স্টার্ট করলাম।

জিতেন নমস্কার করে দাঁড়িয়ে থাকল জেটির উপরে।

বোর্টটা জেটি ছেড়ে জলে ঢেউ তুলে এগোল। সমুদ্রপাবে ইতিউতি হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাঁটাহাটি কবা কটি স্যান্ডপাইপার আর টার্ন বোটের এঞ্জিন স্টার্ট করার হঠাৎ আওয়াজে এমন করে চেঁচিয়ে উঠল যেন ওদের বাড়িতে ডাকাতই পড়েছে।

বোটের মুখটা ঘুরতেই কচি উত্তেজিত গলাতে বলে উঠল, লাইটহাউস। কাল আসার সময়ে তো দেখিনি। ছোট পাহাড়টাব উপরে লাইটহাউসটিকে দেখে কচি উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—দেখা আর লক্ষ্য করার মধ্যে তফাত আছে। কাল অবশ্যই দেখেছিলি কিন্তু লক্ষ্য করিসনি।

—তাই হবে।

—ওই লাইট-হাউসের পরই অসীম সমুদ্র। এখানের সমুদ্রের রং নীল নয়, কালচে। সে জন্যেই 'সম্ভবত' আন্দামানের এই সমুদ্রেব অন্য নাম 'কালাপানি'। ওই পাহাড়টার পাশ কাটিয়েই শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ "এম ভি হর্ষবর্ধন" পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে যায়। আইটিসি-র বে-আইল্যান্ড রিসর্টস-এর লাউঞ্জ আর ডাইনিং রুম থেকে, বেডরুমগুলো থেকেও দেখা যেত সন্ধের পরে যখন আলো ঝলমল জাহাজটি পোর্ট ব্লেয়ার জেটির দিকে এগিয়ে যেত।

—যেত মানে? এখন যায় না?

—এখনও যায় হয়ত। তবে আমি তো আর সেই হোটেলে থাকি না। সেই রিসর্টও তো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সুনামিতে।

—তাই?

—হ্যাঁ।

তারপরে কচি বলল, এখানে কী কী মাছ পাওয়া যায়?

সবরকমের নাম কি আর আমি জানি? তবে কিছু কিছু মাছের নাম অবশ্যই জানি।

তারপর বললাম, যে-সব মাছ খায় এখানকার মানুষে তাদের নাম হল সুরমেই, কোরাই, ম্যাকারেল, সিলভার-বেলিজ, মানে, রুপোলি পেটের মাছ, অ্যাকোরিজ, সার্ডিনস, সিয়ার ইত্যাদি। সার্ডিনের মধ্যে আবার দু'রকম আছে। মানে, আমি যতটুকু জানি, হয়তো আরও অনেকরকম আছে। হারেমগুলা, আর ডুসুমেরিয়া অ্যাকুয়া। এছাড়াও আছে রেজ, বারাকুডা, মুলেট, জেলিফিশ। আর আছে নানারকম অক্টোপাস। যদিও তারা মাছ নয়। শামুক বা মুসেলস। কাঁকড়া এবং চিংড়ি। আরও কত নাম করব। তারও উপরে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা যেখানে এসে বসত করেছেন সেই সব দ্বীপে মিষ্টি জলের পুকুর আছে, অনেক পুকুর তাঁরা নিজেরাও খুঁড়েছেন, সেই সব পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল, ল্যাটা, শিঙ্গি, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছও পাওয়া যায়। তুই খেতে চাস তো ক্যাটারম্যারন দিয়ে জিতেনকে পাঠিয়ে আনিয়ে নিতে পারি।

—সে হবে'খন। আমি তো আছি ক'দিন। না কি তাড়িয়ে দিবি?

—আমি উত্তর দিলাম না। মোটর বোটের সুকান ধরে বসে থাকতে ভারি ভাল লাগে। সুন্দরবনে যখন শিকারে যেতাম তখন অনেক সময়ই সারেং-এর অনুমতি নিয়ে বোটের সুকান ধরে বসে থাকতে ভারী ভালো লাগত। সেখানে বোট, জলের বিভাজক হয়ে ছোট ছোট ঢেউগুলোকে

খালের দু'পাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে চলতে থাকে। সমুদ্রে বা নদীতেও ঢেউ ওঠে দু'পাশে, কিন্তু সমুদ্রে বোটের যে ঢেউ ওঠে তা প্রণিধান যোগ্য নয়, কারণ, সমুদ্রের নিজের ঢেউ বোটের ঢেউ-এর তুলনাতে অনেকই বড় বলে বোটের তোলা ঢেউ আছড়ে পড়েই মিলিয়ে যায় সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে।

সমুদ্র যেন সবসময়েই নিজের সঙ্গে কথা বলে। কথা গড়ে, কথা ভাঙে। স্যান্ডপাইপার, টার্ন ও সী গালেদের তীক্ষ্ণ ডাক মাঝে মাঝে সমুদ্রের সেই স্বগতোক্তিকে ছিদ্রিত করে। হাওয়াতে সমুদ্রের গায়ের নোনা গন্ধ ভেসে আসে। সমুদ্রের নীলচে-কালো-সবুজ, আকাশের নীল আর বিবর্ণ হাওয়া ওই তিনের তিগলবন্দী মিলে কেমন এক ঘোর লাগায়। তখন নির্বাক হয়ে শুধু ভাবতে ইচ্ছে করে। ফেলে আসা দিনের স্মৃতিসমূহকে বিরাট বিরাট সামুদ্রিক সাপের মতো, প্রাচীন বৃষর মতো, জারক রসে জারিয়ে জারণ অথবা চর্বণ করতে ইচ্ছে করে ধীরে-সুস্থে। স্মরণে যা কিছু আছে তা গলা বা পেটের ভিতরে চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। ক্রমশই তা জারিত বা রোমন্থিত হতে থাকে, হতে হতে মস্তিষ্কর মধ্যে তা প্রোথিত হতে থাকে।

প্রায় আধঘণ্টা বোট চালানোর পরে এঞ্জিন বন্ধ করলাম। মাঝ সমুদ্রে তো নোঙর করা যায় না। বড় জাহাজের পক্ষেও তা সম্ভব নয়, তাই বোট হাওয়া আর সমুদ্রের জলরাশির স্পন্দনে উদ্বেলিত হতে থাকে। মৃদুমন্দ হাওয়াতে আর ঢেউয়ের তাড়নাতে বোট এদিক ওদিক হতে থাকে। তার মুখ আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে। কখনও তা পুরোপুরি ঘুরে যায়।

বললাম, এবারে তোর ছিপ ফেল।

কচি তার বঁড়শি ফেলবে এবারে। টোপ হিসেবে সুরমেই মাছ দিয়ে দিয়েছে জিতেন।

—কত লম্বারে তোর লাইন! এতে তো তিমি মাছও খেলানো যায়। আমি বললাম।

—তিমি মাছকে খেলাতে গেলে এই বোটকেই টেনে নিয়ে ডুবিয়ে দেবে যতই শক্ত পোক্ত হোক না কেন লাইন এবং হুইল।

—এ সব কোন দেশি?

—আমেরিকান। ফিশিং রডটি ফাইবার গ্লাসের তৈরি। আর লাইনটা নাইলনের। মেইন লাইন থেকে অনেকগুলো ছোট লাইনও থাকে। ওইসব ছোট লাইনে কচ্ছপ এবং সামুদ্রিক পাখিও অনেক সময়ে ধরা পড়ে। যেমন আলবাট্রস। টোপ খেতে গিয়েই মরে ওইসব পাখি। অবশ্য এগুলো লং-লাইনেই মরে বেশি। আলবাট্রস পাখি সব সুদ্ধু একুশ রকমের হয়। তার মধ্যে অ্যাসন্টার্ডাম আর চ্যাথাম আলবাট্রসই প্রধান। আমেরিকাতে প্রায় এক লক্ষ আলবাট্রস পাখি প্রতি বছরে মারা যায়, টোপ দিয়ে যখন লাইন নামানো হয় জলে তখনই তারা তা খেতে গিয়ে মরে। সামুদ্রিক কচ্ছপেরাও এইভাবে মরে। আমস্টার্ডাম আলবাট্রস আর চ্যাথাম আলবাট্রস পাখিরাও এখন 'এনডেনজারড স্পেসিস' বলে ঘোষিত হয়েছে আমেরিকাতে।

—ফিশিং রড কি একরকমেরই হয়?

—না, না। অনেক রকমেরই হয়। বাসস ফিশিং রড, ট্রাউট ফিশিং রড, ক্রাপি ফিশিং রড ইত্যাদি নানারকম ফিশিং রডই হয়। তবে আমার এই ফিশিং রড সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যে নয়। নদী, হ্রদ ইত্যাদির জন্যেই এগুলো ব্যবহৃত হয়। ফিশিং রড গ্রাফাইটের এবং অন্য নানা জিনিসেরও হয়। তবে ফাইবার গ্লাস ফিশিং রডের নমনীয়তা সবচেয়ে বেশি।

তারপরে বলল, আমি আর কতটুকুই বা মাছ ধরি এখন। তাছাড়া,

যৌবনের শক্তি তো আর নেই। তেমন বড় মাছকে খেলিয়ে তোলার ক্ষমতাও নেই এই ছিয়াত্তর বছর বয়সে। নানারকম ছিপ ও সরঞ্জাম কেনার পয়সাও নেই। তাই যা আছে তা দিয়েই যতটুকু হয়, হবে। না হলে হবে না। আমি তো আর মাছ ধরার প্রতিযোগিতাতে নামছি না। সময় কাটাবার এবং জলে ভাসবার এমন মজা, মাছ ধরার মতো কোনও কিছুতেই নেই।

ব্রেকফাস্ট কি এখনই খাবি?

আরে দাঁড়া। আগে লাইনটা ঠিকঠাক করি, টোপ সব গাঁথি, তারপরে ফাৎনা ভাসাই। তারপরে হবে ব্রেকফাস্ট।

—তোর ফাৎনাবা মাছি নয় তো যেন লালরঙা ফুটবল।

কচি হেসে বলল, যা বলেছিস। গতবছর হোয়েল-ওয়াচিং ট্রিপে গিয়েছিলাম। সেখানেই বোট দাঁড় করিয়ে আমাদের তিমি মাছ দেখাচ্ছিল—নানারকমের তিমি মাছ সেখানে। দেখলাম 'ম্যাকডনাল্ড' এবং নানা কোম্পানির ফিশিং-বোট এইরকম সব টোপ ভাসিয়ে মাছ ধরছে। নানারকম মাছ। তিমিদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা চলছে কে কত মাছ ধরতে আর খেতে পারে।

—কোথায় দেখতে গেছিলি তিমি মাছ?

—বস্টনের কাছেই Rose Wharf-এ পৌঁছে সেখানের Cape Ann Whale Watch কোম্পানি থেকে টিকিট কেটে বোটে উঠলাম। বোটের নাম ছিল Hurricane II. হু হু হাওয়ার আবহে আটলান্টিকের মধ্যে প্রায় ত্রিশ নটিকাল মাইলস গিয়ে Stelwagen Bank বা Jeffry's Ledge-এ পৌঁছে বোটের এঞ্জিন বন্ধ হল একটু ক্ষণের জন্যে। তারপরই এঞ্জিন স্টার্ট করে Low gear-এ চলতে লাগল বোট। জায়গাটা মাছের ডিপো। একেবারে কিলবিল করছে নানা মাছ—অসংখ্য

Shoals of fish জলের নিচে যাতায়াত করছে। তিমি তো এক গরাসে এক কুইন্টাল মাছ খায়। মাছের আড্ডা বলেই তিমিরা আসে এখানে এবং তিমিরা আসে বলেই ট্যুরিস্টরাও আসে দেখলাম, হোয়েল ওয়াচিং করতে। একাধিক ফিশিং বোটও তাই সেখানে মাছ ধরছে। ওই অঞ্চলে ম্যাকডনাল্ড কোম্পানির যত দোকান আছে সব দোকানের মাছই নাকি যায় সেখান থেকেই। ম্যাকারেল, স্যামন, ঈল, সার্ডিন, টুনা নানারকমের মাছ পাওয়া যায়।

তারপর বলল, শুধু তিমিই নয়, সেখানে এতরকমের সামুদ্রিক পাখি দেখলাম তা কী বলব।

—কী কী পাখি দেখলি? সী-গাল আর টার্ন?

—আরে তারা তো ছিলই। তারা ছাড়াও ডাবল-ক্রেস্টেড করমোরান্ট, মানে, আমাদের পানকৌড়ির দাদা, উইলসন্স স্টর্ম পেট্রাল, নর্দার্ন গ্যানেট, সাদা পিঠ আর কালো ডানার শিয়ারওয়াটার পাখি, গ্রেটার এবং স্যুটি টার্ন, হেরিং গাল, গ্রেটার কালো-পিঠ টার্ন, রিং-বিলড গাল ইত্যাদি। কত সুন্টুনি-মুন্টুনি মুঠি-ভর পাখি সুগভীর অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে—অধিকাংশই মাছের লোভে—ডাঙা থেকে কত দূরে! ভাবলে অবাক হতে হয়। সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে ওঠে, যখন ঝড় ওঠে, তখন ওই পাখিরা কোথায় থাকে, জানতে ইচ্ছে করে।

—সত্যি। তুই কত ঘুরেছিস। তুই তো হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডস-এও গেছিস।

—হ্যাঁ। প্রশান্ত মহাসাগরে। স্যেশেলস আইল্যান্ডসএও গেছি—ভারত মহাসাগরে।

—তুই তো তোর মেসোমশাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে পুব

আফ্রিকার ডার-এস-সালাম থেকেই ফিরে গেলি, তাই তোর স্যোশলস আর দেখা হল না। তবে আমরা পূর্ব আফ্রিকার কিনিয়া আর তানজানিয়ার বিভিন্ন জঙ্গল খুব করে ঘুরেছি। কী বল?

—হ্যাঁ। তা ঘুরেছি। এখন মনে করলে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

কচি বলল, তিমিদের সব কথা বলা হল না। সেখানে সমুদ্র প্রায় চারশো ফিট গভীর। বড় বড় ঢেউ উঠছে জোর হাওয়াতে জলে আর বোটের প্রপেলার সেই ঢেউয়ের সঙ্গে টক্কর দেওয়াতে জল চলকে আসছে বোটের দু'পাশে এবং মধ্যেও। আর যারা ক্যাবিনের বাইরে বসেছিলাম বারান্দাতে, তারা প্রায় পুরো ভিজে গেলাম। গ্রীষ্মকাল হলেও হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা। ভেজা গায়ে শীত শীত করছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সেখানেই ঘুরে-ফিরে সবশুদ্ধ আটটা বড়-ছোট তিমি দেখলাম আমি আর আমার আমেরিকান বান্ধবী ম্যারিয়ান। খুব কাছে একটি বিরাট হাম্পব্যাক তিমি ভেসে উঠল। বোটকে এক ধাক্কা মারলে সলিল সমাধি নিশ্চিত—যদিও সকলেরই লাইফ-জ্যাকেট পরা ছিল। আমাদের তিমি চেনাচ্ছিল একটি মোটাসোটা আমেরিকান তরুণী। সে জুওলজিস্ট। তারপরে বলল, জানিস, একটা তথ্য জেনে অবাক হলাম তিমি সম্বন্ধে।

—কী তথ্য?

—যে-তিমি, যে-মাছ বেশি খায় তাদের লেজের রং নির্ভর করে তারই উপরে। যেমন ঈল মাছ খেলে একরকম, স্যামন খেলে অন্যরকম। প্রকৃতির কী অপূর্ব লীলা। দেখলাম একটা তিমির লেজের রং সবুজ শ্যাওলার মতো। গায়ের রং খয়েরি আর বাদামিতে মেশানো—অধিকাংশরই। চামড়া রুক্ষ। কুমিরের চামড়ার মতো।

ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের দাক্ষিণ্যে বসার ঘরের সোফাতে বসেই তিমি মাছ দেখা যায় হয়তো এর চেয়ে অনেক ভালভাবে। কিন্তু নিজ চোখে দেখা অন্য কথা।

প্রথমেই তিমি মাছ দেখা গেল ঘড়ির কাঁটার দুটোর জায়গায়—ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিচ্ছে জলের মধ্যে ফোয়ারা তুলে। সেটা ফিন তিমি। তারপরই বাঁ দিকে নাইন-ও-ক্লক-এ দেখা গেল একটা বিরাট হাম্পব্যাক তিমিকে।

আমি বললাম, মবি ডিক-এর কথা মনে আছে? গ্রেগরি পেক-এর কী দুর্দান্ত অভিনয়।

—মনে নেই? আগেকার দিনের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই অন্যরকম ছিলেন। আমাদের দুর্গাদাস, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অহীন চৌধুরী ইত্যাদিরা?

—কেন? আরও এগিয়ে আয়। তুলসী চক্রবর্তী, উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার, ভানু ব্যানার্জ, রবি ঘোষ...আরও কত নাম মনে পড়ে।

—আর হলিউডের ওঁদের নামকেও বাদ দিলে চলবে না। যেমন অ্যান্থনি কুইন, হামফ্রি বোগার্ট, গ্যারি কুপার, স্টুয়ার্ট গ্রাঞ্জার, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা। তারপরের ইউল ব্রেইনার, মেল ফেরার ইত্যাদি ইত্যাদি।

—তা ঠিক। যদিও আমার আর তোর পটল তোলার সময় হয়ে গেছে তবুও বলব আমাদের সময়টা অন্য রকম ছিল—আ টাইম অফ দ্য গ্রেটস। কী সাহিত্যে, কী অভিনয়ে, কী সঙ্গীতে সে একটা সময় ছিল বটে।

—আসলে আমরা যে বুড়ো হচ্ছি তার অকাট্য প্রমাণও এটাই। আমাদের এই মনোভাবই প্রমাণ করে যে আমাদের দিন শেষ।

নিশিশেষের বাঁশি বাজছে এখন—তা আমরা স্বীকার করি, আর নাই করি।

লাইনটা খুব যত্ন করে নামাল কচি সূর্যর আলো পড়া ঝকঝকে সমুদ্রর জলে। লাইন নামানো শেষ হলে জলে হাত ধুয়ে কচি বসল এসে আমার সামনে। তারপরে পাইপটা বের করে ধরালো।

—তুই এখনও ছাড়িসনি?

—না। থাকি তো কলকাতা শহরে। গড়িয়াহাট বা শ্যামবাজারের মোড়ে পাঁচমিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে পল্যুশনের জন্যে তো মরে যাওয়ারই কথা। দিনে পাঁচ-দশটা সিগারেট বা পাঁচ টান পাইপ খেলে আর কী হবে? আগে চারদিকেব পরিবেশ শাসন করো, বাস মিনিবাস, গাড়ির ধোঁয়া বন্ধ করো, তারপরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হাত দাও। এসব বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো। আবহাওয়ার দূষণ আর শব্দ দূষণ বন্ধ করার জন্যে কিছুমাত্র করা হচ্ছে না, ঘরে ঘরে ক্যানসার, আর যত দোষ শুধু সিগারেট খেলে আর পাইপ খেলে, দু'খিলি পান খেলে? আমরা আর কতদিন বাঁচব? আমাদের মৃত্যু তো ঘনিয়েই এসেছে। এতগুলো বছর যখন বেঁচে এলাম তখন আর দু'বছব বেশি বাঁচবার জন্যে এসব আইন-মানার কোনও প্রয়োজন আমি অন্তত বোধ করি না।

বলেই বলল, তুই কি পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস?

—এখানে সেরকম পান পাই-ই বা কোথায়? তাছাড়া, সব নেশা, সব আশা এখন ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

—সব কামনা বাসনাও। কী বলিস?

—হ্যাঁ। সবই। সব ছেড়েছুড়ে এখন ওপারে যাওয়াব জন্যে তৈরি হয়ে বসে থাকাই ভাল। আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা আর কে আছে বল? বিশেষ করে বন-জঙ্গলের আর শিকারী বন্ধু-বান্ধবেরা?

—তা ঠিক। তবে আমার সঙ্গে অধিকাংশেরই অনেক দিন থেকে কোনও যোগাযোগই ছিল না। তাই বিচ্ছেদব্যথাটাও তেমন অনুভূত হয়নি। তুই-ই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতিস।

—যোগাযোগ রাখতাম কিন্তু এখন আর ক'জন আছে যোগাযোগ রাখার মতো।

—কারা কারা চলে গেছে?

—হাজারিবাগের নাজিম সাহেব, ইজাহার, সুব্রত চ্যাটার্জি।

—সুব্রত তো গোমিয়াতে থাকত না?

—সে তো চাকরি সূত্রে। আসলে ওদের বাড়ি তো ছিল হাজারিবাগেই, ক্যানহারি হিল রোড এ—তোদের বাড়ির কাছেই ছিল। ওর বাবা সত্যচরণ চ্যাটার্জি হাজারিবাগের পুলিশ সাহেব ছিলেন। তখন হাজারিবাগ জেলার আয়তন ছিল মস্ত বড়। কোডারমা-টোডারমা সবই হাজারিবাগের অধীনেই ছিল। সুব্রতদের বাড়িতে ঢোকার সময় পথের একপাশে সারি দেওয়া প্রাচীন সব ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল। তাই বাড়ির নাম ছিল 'দ্য ইউক্যালিপটা'। ইউক্যালিপটাসের গন্ধ ম' ম' করত। বর্ষাকালে বা অন্য সময়েও একপশলা বৃষ্টির পরে সেই গন্ধ যেন আরও তীব্র হত।

তারপরে বললাম, সুব্রত আর ইজাহারুল হক সীতাগড়া পাহাড়ের নীচের জঙ্গলে সীতাগড়ার মানুষখেকো বাঘকে মেরেছিল তোর মনে নেই? কী বিরাট বাঘ ছিল। দশ ফিট ছ'ইঞ্চি 'ওভার দ্যা কার্ভস'। সেই বাঘের চামড়া এখনও সুব্রতর টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটের বসবাব ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। কাথবার্টসন হার্পারের দোকান থেকে ট্যান করা, নাকি ম্যাড্রাসের ভ্যান ইনজেন অ্যান্ড ভ্যান ইনজেন থেকে? ঠিক মনে নেই?

—কাথবার্টসন হার্পারের মালিক আর্মেনিয়ান ফ্লেভিয়ান সাহেবকে মনে আছে তোর?

—আছে বইকি।

—কত ট্রফি ওঁরা মাউন্ট আর ট্যান করে দিয়েছেন। বাঘ, ভাল্লুক, শম্বর, বারাশিঙ্গা, শুয়োর। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর যুবক ছেলেরা দোকান দেখত। তাদেরও মনে আছে। ১৯২২-এ শিকার বে-আইনি হয়ে যাওয়ার পরে তো ওঁদের মূল ব্যবসাই উঠে গেল। বুড়ো ফ্লেভিয়ান তো আগেই মারা গেছিলেন। ছেলেরাও পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে গেল।

—রইল আর কে? পার্কস্ট্রিটের ফ্লুরিজ'এর মালিক ছিলেন একজন ইতালিয়ান। তাঁর কাছ থেকে জিৎ পালেরা কিনে নিলেন। তাঁরা তো পুরো পার্কস্ট্রিটই কিনে নিলেন? জিৎ পালও তো চলে গেলেন কিছুদিন আগে। ভারি ভদ্রলোক ছিলেন মানুষটি।

—তা ঠিক। এ এন জন-এর মিস্টার জনও তো মারা গেছেন কবে। তাঁর সেলুন এখন চালান তাঁর ছেলেরা।

—কটকের চাঁদুবাবু এখন কেমন আছেন রে? খোঁজ রাখিস?

—রাখি। গত বছর যখন পুরী গেছিলাম তখন একটা গাড়ি নিয়ে গেছিলাম কটকে। চাঁদুবাবুর সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। তার আগেও পায়ের একটা আঘাতের জন্য হাঁটা-চলা করতে পারেন না বহুদিন। স্ট্রোকটা এখন সামলে উঠেছেন। অনেক বছর পর গল্প করে এলাম।

—ওঁদের বাড়ি এখনও বাখরাবাদেই আছে? কাঠজুরি নদীর কাছে?

—হ্যাঁ। পৈত্রিক নিবাস। চাঁদুবাবুর বাবা অমরবল্লভ দে ছিলেন

ওড়িশার বামরা করদ রাজ্যের দেওয়ান। তাঁর ছোটভাই গায়নোকলোজিস্ট, ছিলেন বুড়লা মেডিক্যাল কলেজে—সম্বলপুরের লাগোয়া।

তারপর বললাম, চাঁদুবাবু আমাদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ওড়িশার বন্ধুদের মধ্যে থাকার মধ্যে একমাত্র উনিই আছেন। কটকচণ্ডী রোডের ফুটুদা, প্রভাতকুমার সুর এবং সুর পরিবারের জুঁইবাবু, এবি অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস-এর অনন্ত বিশ্বাসও চলে গেছেন। বছরখানেক আগে। অবশ্য অঙ্গুলের বিমলবাবু এখনও আছেন।

—আমি আর হাঁদুবাবু এখনও ব্যাট করে যাচ্ছি।

—ফুটুদার মৃত্যুর পরে চাঁদুবাবু আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে একটি ওড়িয়া কবিতা উদ্ধৃত করেছিলেন।

—এই কচি, তোর ফাৎনা নড়ল। দ্যাখ, দ্যাখ, তোর রড না টেনে নিয়ে যায়।

কচি লাফিয়ে পড়ল ওর হুইল-শুদ্ধ রডের উপরে।

তারপরই বলল, ছুপকি দিয়ে চলে গেল রে।

বললাম, যেতেও পারে। এখানে ছেনালি করা অনেক সুন্দরী মেয়ে-মাছ আছে।

—তাই?

—তাই। আমার সঙ্গে একটা টুনা মাছের প্রেম হয়েছিল।

—বলিস কী রে।

—সত্যি। তোকে বলব একদিন সে গল্প। একটা ব্লু-ফিন টুনা।

—চাঁদুবাবুর কবিতাটা বললি না? বল এবারে।

—হ্যাঁ। শোন।

"কেহি রহি নাই
রহির নাই
রহিব না ইটি।
এই ভব রঙ্গ।
ভূমিতলে
সর্বে নিজ নিজ
অভিনয় সারি
বাহুরিবে কালবেলে।"

—তুই না হয় একটু একটু ওড়িয়া জানিস, আমি তো জানি না। মানেটা বলে দে।

—মানে হল কেউই থাকে না, থাকার জন্যে আসে না, এখানে থাকবে না। এই রঙ্গ মর্ত্যভূমির। এ মঞ্চে সবাই নিজ নিজ অভিনয় সেরে সময় হলেই চলে যাবে।

—কচি বলল, বাঃ। একেই বলে প্রাকৃত অথবা প্রকৃত কবিতা।

—মহানদীর সাতকোশীয়া গণ্ডের কাছের পুরুণাকোটের গভীর জঙ্গলের মধ্যে পানমৌরির চালাঘরের সামনে শীতের রুখু হাওয়াতে ওঠা বনমর্মরের মধ্যে সেই যে একটি মাতাল পানমৌরির একটি বোতল বগলের নিচে ধরে যে গানটি গেয়েছিল, মনে আছে তোর?

—মনে আছে যে গান গেয়েছিল, আমরা জীপে বসেই শুনেছিলাম। চাঁদুবাবু আর ফুটুদাদের দুর্গা মুহুরি পানমৌরী কিনতে নেমেছিলেন। গান শুনেছিলাম বটে কিন্তু গানের কথা মনে নেই।

—সে তো গায়ক নয়, ফিলসফার। গাইছিল, "আলো শুকিলা সাদু, মন মরি গন্ধা দ্বিপাহারু।"

—মানে?

—মানে হল, "ওরে শুকনো কচু, মন মরে গেল দ্বিপ্রহরে..."

কচি খুব জোরে হেসে উঠল। তারপর বলল, নে এবারে তোর জিতেন কি ব্রেকফাস্ট দিয়েছে তা বের কর। চা না কফি, কিছু দিয়েছে কি?

—মনে হয় দেয়নি। গ্রে গুজ ভোদকা আর অ্যাঙ্গোস্টুরা বিটার্স দিয়েছে বলেই বোধহয় চা-কফি দেয়নি।

—এই অ্যাঙ্গোস্টুরা বিটার্স-এর দু'ফোঁটা এক পেগ জিনের মধ্যে ফেলে দিলেই 'পিঙ্ক জিন' হয়ে যায় তা জানি কিন্তু ওই বস্তুটি সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না।

—এটি তৈরি করে অ্যাঙ্গোস্টুরা ইন্টারন্যাশানাল লিমিটেড। এতে ৪৫% অ্যালকোহল কনটেন্ট আছে। "An aromatic preparation of water, alchohol, genitor, vegetable flavouring extractives and vegetable colouring matters as well."

কচি ব্রেকফাস্টের বাক্সটা খুলতে খুলতে ইয়ার্কি মেরে বলল, তুই কত্ত জানিস রে বুড়ো!

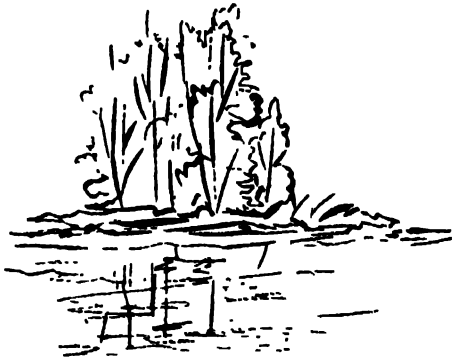

প্রায় সারাটা দিন গেল। কচির ফাৎনা বা float আর একবারও নড়ল না। টার্ন আর সী-গালের ক্বচিৎ ডাকের মধ্যে, মৃদুমন্দ হাওয়ার মধ্যে আমরা দুই বন্ধু পুরনো দিনের নানা গল্প করতে করতে, স্মৃতিচারণ করতে করতে কাটিয়ে দিলাম দিনটি। জীবনের মালা থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে পড়ল।

—এখন তাহলে দ্বীপ-মুখো হই। কী বলিস কচি?

—হ্যাঁ। ফিরতে ফিরতে তো সূর্য ডুবে যাবে। অন্ধকারে তোর দ্বীপের ভাঙা জেটি দিয়ে পাড়ে উঠেও তো বেশ অনেকখানি উঠতে হবে ওপরে।

—হ্যাঁ। তা হবে।

—এখন মাঝে মাঝেই হাঁটু ব্যথা করে। জানিস। চারদিকে হাঁটু-বদলের হিড়িক পড়েছে।

—হ্যাঁ। অনিল তো বদলেই নিল।

—কোন অনিল?

—অনিল আর ক'টা আছে? অনিল দ্য গ্রেট।

—ও

ওর কথাই আলাদা।

প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ওর। মদ খাবার ক্ষমতা, নারীসঙ্গ করার আকাঙ্ক্ষা, হয়তো ক্ষমতাও এবং যশাকাঙ্ক্ষা ওর দিনে দিনে যেন আরওই প্রবল হচ্ছে দৃষ্টিকটুভাবে।

আমাদের পাড়ার হামদুদার ছোট ছেলেটা, ধান্দু যখন শিশু ছিল তখন ওর সামনে নানারকম মিষ্টি-সাজানো একটি থালা ধরে যদি বলা হত, ধান্দু, কোনটা খাবে বাবা?

ধান্দু বলত, এতা খাব, ওতা খাব, থব খাব। অনিলকে দেখে হামদুদার ছোট ছেলে ধান্দুর কথা মনে পড়ে যায় আমার। অনিলের খিদের শেষ নেই। বয়স যত বাড়ছে, খিদেও তত বাড়ছে। কিছুই বাকি না রেখে সব খাবার ইচ্ছে আরও প্রবল হচ্ছে।

—নানারকম মানুষ নিয়ে পৃথিবী। সবাই এঁটে যায় এখানে। সবরকম মানুষই।

দুজনে মিলে গল্প করতে করতে এইরকম সামুদ্রিক পরিবেশে আদিগন্ত নীল জলরাশির মধ্যে ভাসতে ভাসতে নীলাকাশের নীচে এক বোতল গ্রে-গুজ ভোদকা শেষ করে নেশাগ্রস্ত হইনি আমরা যদিও, কিন্তু সামান্য 'হাই' হয়েছিলাম। ভোদকাটি খুবই উঁচুমানের। তবে দু'একটা মাছ যদি কচি পেত তাহলে খুশি হতাম আমি। নিজেকে বড়ই অপরাধী লাগছে।

কচি আমার মন পড়ে বলল, তোর কী দোষ। সম্ভবত এখানে জল খুব গভীর, নয়তো মাছেদের যাতায়াতের পথে পড়ে না এ-দরিয়া। তাছাড়া, পূর্ণতার প্রত্যাশা থাকলেই কি সবসময়ে সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। শূন্যতাকে মেনে নেওয়া তো একটা মস্ত শিক্ষা, না, কি? জীবনে

এতখানি পথ চলে এসেও যদি শূন্যতাকে খুশি মনে গ্রহণ না করতে পারি তাহলে বলতে হয়, আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি।

তারপরই কচি বলত, তোর কি মনে আছে? একবার আমি, তুই আর গোপাল শিকারে গিয়ে সারাদিন কাটকামচারির জঙ্গলে 'হাঁকোয়া' করিয়েও একটিও পশু কিংবা পাখি পেলাম না। যখন দিনের শেষ আলোতে, শীতের দিন ছিল, বেলাও ছোট ছিল, আমরা অনেক দূরে, একটা মস্ত সাগুয়ান গাছের নীচে পার্ক করানো আমাদের জিপের দিকে বন্দুক কাঁধে মনমরা হয়ে হেঁটে যাচ্ছি, নাজিম সাহেব বললেন, শিকার মানে কি শুধুই বন্দুক-রাইফেলের ট্রিগার টানা? একবার বিহারের গভর্নরের শুট-এ সারাদিন হাঁকোয়া করেও একটি ঘুঘুও বেরোল না অথচ গভর্নরের শিকারের অনেক আগে থেকেই সেই অঞ্চলে ফরেস্ট গার্ড এবং পেশাদার শিকারীদের পাঠিয়ে বাঘ থেকে আরম্ভ করে অন্য সব প্রাণীর 'রাহান-সাহান'-এর তত্ত্বতলাশ করে তারপরই মাচা বাঁধা হয়। বুঝলেন বাবুরা। শিকারের গোড়ার কথা হচ্ছে অনিশ্চয়তা। জীবনেও এই শিক্ষা নিতে হবে। তাছাড়া, এই জঙ্গলে, এই রুখু হিমেল হাওয়া, প্রকৃতির এই বিধুর সৌন্দর্য এসব কি কিছুই নয়?

কচিকে বললাম, আমার বাবা বলতেন, 'ফেইলিওরস আর দ্যা পিলারস অফ সাকসেস।'

তারপর বললাম, কাল যদি আবার মাছ ধরতে যাস তখন দেখবি হয়তো এত মাছ পেলি...

এখানে বেশি মাছ ধরে লাভ কী? খাবার লোকও নেই, বিলোবার লোকও নেই। তাছাড়া তোর সঙ্গে দেখা করতেই আসা আর আন্দামান দেখতে, মাছ ধরা তো একটা ছুতো।

ভালই বলেছিস। এই জীবন, এক বা একাধিক ছুতো নিয়েই আমরা

কাটিয়ে দিই। আসলে, জীবনের উদ্দেশ্য বলে আমাদের কারোরই কিছু নেই। লেখা-পড়া, পয়সা রোজগার করা, তারপর যাতে বলে 'ঘর-সংসার' করা বলে, তা করা। বিয়ে করা, ছেলেমেয়ে পয়দা করা, তাদের বিয়ে দেওয়া, তারপর নাতি-নাতনি কোলে করে রোদে পিঠ দিয়ে বসে কুমড়োফুল ভাজা খাওয়া অথবা লাউ চিংড়ি। রিটায়ারমেন্টের পরে সকালে বাজারে যাওয়া, তারও আগে পার্কে গিয়ে ছেলে বৌ-এর নিন্দা করা—এই তো জীবনের বৃত্ত।

বললাম, কাল এলে, ক্যাটম্যারনে করে আসিস। তুই একাই চালাতে পারবি।

তুই সঙ্গে না এলে চলে যাওয়া দিনের গল্প করব কার সঙ্গে?

বোটের মুখটা ঘুরিয়ে 'দ্য সান্ডপাইপার্স'-এর দিকে চলতে লাগলাম। আমাদের পেছন থেকে এক জোড়া হোয়াইট বেলিড ঈগল জোরে ডানা সপ্‌সপ্‌ করে উড়ে যাচ্ছিল দ্বীপের দিকেই। পাখিগুলো এতক্ষণ যে কোথায় ছিল, দেখাই যায়নি।

আমি স্টিয়ারিং-এ আর কচি আমার পাশে বসে আছে। দিনশেষের হাওয়াতে একটা সামুদ্রিক নোনা গন্ধ লেগে আছে, জলের পাখির তলপেটে যেমন গন্ধ থাকে।

কচি বলল, গোপাল কতদিন হল গেছে রে? কী হয়েছিল ওর?

—তা, নয়-নয় করে প্রায় বছর কুড়ি হতে চলল।

সত্যি! সময় কী তাড়াতাড়ি যায়।

—আমি তখন কোথায় ছিলাম?

—তুই আলাস্কাতে গেছিলি।

—তা, গোপাল মারা গেল কোথায়? হাজারিবাগে না কলকাতায়?

মারা গেল বেলেভ্যুতে। কলকাতাতেই। আইসিয়্যু-তে ছিল। আমিও

তখন কাজে বম্বে গেছিলাম। তবে ফিরেই ওকে দেখতে যাই। জয়শ্রী মানে, গোপালের স্ত্রী, কারোকেই দেখতে যেতে দিচ্ছিল না। আমি প্রায় জোর করেই যাই। ওর মুখের কাছে ঝুঁকে বললাম, গোপাল, আমি এসেছি। ও চোখ দুটো খুলল। ঘোরে ছিল। জবাফুলের মতো লাল চোখ।

বললাম, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। আমরা আবার কুসুমভাতে যাব শিকারে। তুমি পাটনা থেকে বাখরখানি রোটি, শিরমাল এ সব আনাবে, প্রতিবারই যেমন আনাও। নাজিম সাহেব তিতিরের কাবাব বানাবেন আগেকার দিনের মতো।

আমার কথা শুনে ওর চোখ দুটো একবার স্পন্দিত হল, তারপরই বন্ধ করে ফেলল।

সেই দিনই মাঝরাতে ও চলে গেল। হাজারিবাগ আর যাওয়া হল না।

পরদিন রবিবার ছিল। অনেকেই বলেছিল, শববাহক গাড়ি করেই ওকে কেওড়াতলায় নিয়ে যাওয়ার কথা। আমরা ক'জন বললাম, না, ওকে কাঁধে করেই নিয়ে যাব।

কে যেন বলেছিল, বুড়োদা। আপনার পায়ে ব্যথা, হাঁটতে পারবেন অতটা?

বলেছিলাম, পারব।

ভাবছিলাম, কত রাত ও দিন বন্দুক বা রাইফেল কাঁধে কত পাহাড়ে জঙ্গলে কত মাইল হেঁটে গেছি ওর সঙ্গে, পাশাপাশি, কত না জায়গাতে। আর এই শেষের দিনে অতটুকু পথ ওর সঙ্গে হাঁটতে পারব না?

সেই বিখ্যাত উর্দু শয়রীটির কথা মনে পড়ে গেল আমার। গোপালের হয়তো সেই শায়রীটার কথাই মনে পড়ছিল তখন।

"গুস্তাকি ম্যায় স্রিফ করেঙ্গে ইকবার
যব সব পায়দল চলেঙ্গে
ম্যায় কান্ধে পর সওয়ার।"

একবারই অপরাধ করব। যখন সকলেই পায়ে হেঁটে যাবে তখন আমি একা অন্যদের কাঁধে চড়ে যাব।

কচি বলল, হঠাৎই এরকম স্ট্রোক হল? কোনও প্রায়র ওয়ার্নিং ছিল না?

ছিল বইকি! হাজারিবাগে ওর ছেলে গুটুগুটু ও ভাগ্নে পুটুসকে নিয়ে গেছিল। ওদের গয়া রোডের বাড়ির পেছনের শুটিং রেঞ্জে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল প্র্যাকটিস করছিল। ওদের বাড়ির পেছনে তো মস্ত বড় টাঁড় ছিল, মাঝে মাঝে খোয়াই—একেবারে কানহারি পাহাড়ের নিচ অবধি—তাই রেঞ্জ করার অসুবিধে ছিল না। এমন সময়ে ওর ডান চোখটা ঠেলে বেরিয়ে এল। ও আঙুল দিয়ে চোখটাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। রক্তও বেরিয়েছিল একটু। ওর প্রেসার অত্যন্ত বেশি ছিল। হাইলি ডায়াবেটিকও ছিল। কিছুদিন আগেই ওর অফিসে ও অজ্ঞান হয়ে গেছিল। ড্রাইভার ও গুটুগুটু ওকে বাড়িতে এনে ডাক্তার ডেকেছিল। ডাক্তার এসে বলেছিলেন একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছে। হার্ট এবং সেরিব্রাল দুই-ই। এখুনি নার্সিং হোম-এ নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু ও গেল না। আমাদের কারোওকেই খবর পর্যন্ত দেয়নি। তুই তো জানিস যে ও ওরকমই ছিল। কখনওই কারও কথা শোনেনি। একসময়ে চেইন-স্মোকার ছিল। বিয়ারও খেত বেশ বেশি।

কচি বলল, মনে আছে? একবার আমরা সকলে মিলে রাজডেরোয়া ন্যাশানাল পার্কে গিয়ে তিনদিন ছিলাম। গোপাল ও সুব্রত সঙ্গে ওদের স্ত্রীকেও নিয়ে গেছিল। নাজিম সাহেবও গেছিলেন। প্রতি সকালে ব্রেক ফাস্টের পরে ওর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটিতে পয়েন্ট টু-টু সাইলেন্সার

লাগানো পিস্তলটি এবং দু-তিন বোতল বিয়ার নিয়ে ও বেরিয়ে পড়ত। কোনওদিন তুই আর কোনওদিন আমিও যেতাম সঙ্গে। কিছুদূর জঙ্গলে হেঁটে কোনও বড় গাছতলাতে বসে বিয়ার খেত আর মুরগি নয় তিতির মারত সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে। অভয়ারণ্যের মধ্যেই শিকার।

—ওর মধ্যে চিরদিনই একজন ডোন্ট-কেয়ার আইন-অমান্যকারী ছিল। সব আইনকেই ও ঘৃণার সঙ্গে অমান্য করত। বলতো, ছাড়ো তো!

এক সকালে সেখানে একটা ময়ূরও মেরেছিল।

তারপর?

ছেলে আর ভাগ্নেকে নিয়ে তো হাজারিবাগে চলে গেল নিজেই ওর মারুতি জিপসি চালিয়ে। আর তারপরেই তো চোখ বাইরে আসার ঘটনা।

তারপর?

তারপর সকলকে প্যাক-আপ করতে বলে আধঘণ্টার মধ্যে গাড়িতে উঠে নিজেই গাড়ি চালিয়ে কলকাতা। সুব্রত তখন কলকাতাতেই ছিল। সে-ই জোরাজুরি করায় এবং ডাক্তারকে দিয়ে খুব ভয় দেখিয়ে বেলেভ্যুতে ভর্তি করালো। সেখানে ভর্তি হওয়ার পরই একটা মেজর স্ট্রোক হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আইসিউ-তে ভর্তি করানো হল অজ্ঞান অবস্থাতে। তারপরের কথা তো বললামই। ও আইন মানত না, ডাক্তারদের মানত না, কারও কথাই শুনত না। সারাটা জীবনই এইরকম, বিদ্রোহী জীবনযাপন করল। অন্যে যাই করত ও সেই সবই বর্জন করে চলত উইথ ইমপিউনিটি। কলকাতাতে কোনও রবিবার সকালে যদি বলতাম চলো, ক্যালকাটা ক্লাবে যাই বিয়ার খেতে। ও জাপান থেকে আনা কিমোনো পরে বাড়ির ছাদের ফুলের গাছের টবে জল দিত। বলত, হুসস্। ও সব ক্লাব-টাবে শুধু টাকার গল্প হয়। তুমি যাও। ক্লাব-কালচারে আমি বিশ্বাস করি না।

ক্লাব বলতে ও একমাত্র যেত সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে। তুই তো জানিস সেই ক্লাব আগে ছিল টালিগঞ্জে গল্‌ফ ক্লাব রোডে। তারপর নকশাল আমলে যখন ওখানে পুলিশদের রেসিডেন্সিয়াল বাড়ি হয় তখন ক্লাব স্থানান্তরিত হয় এস এস কে এম হাসাপাতালের পেছনে—পুলিশ রেঞ্জে।

তারপর বললাম, গোপাল সর্বার্থে একজন ওরিজিনাল মানুষ ছিল। ওর কোনও প্রোটোটাইপ আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।

কচি বলল, আমারও না।

'দ্য স্যান্ডপাইপার্স'-এ ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। সমুদ্রের বা বড় হ্রদের পাশে সূর্যাস্তর পরেও অনেকক্ষণ আলো থাকে। তারপরে আলোর আভাস। এখন শুক্লপক্ষ। আকাশের একদিকে লাল সূর্যটা অস্ত গেল কালো জলের মধ্যে আর আকাশের অন্যদিকে সপ্তমীর চাঁদ উঠল জলের উপরে। রুপোলি সাপের মতো কিলবিলে, ইলিবিলি-করা লক্ষ লক্ষ সাপ সমুদ্রের দখল নিল। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারাটা তার সবুজ আর নীলের স্নিগ্ধ দ্যুতি সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে একটি ফুলের মতো ফুটে রইল।

বোটের এঞ্জিনের গুটগুট শব্দ শুনতে পেয়েই জিতেন একটা পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ হাতে নিয়ে বাংলো থেকে নীচে নেমে এসেছিল।

বললাম, টর্চ এনেছ কী করতে এত আলো থাকতে।

জিতেন বলল, আপনার জন্যে তো আনি নাই ছার। অতিথি আমাগো শহুরে মানুষ। তাঁর তো দরকার হইতে পারে।

বললাম, এই অতিথি বিশ্বভ্রমী। ইনিও আমারই মতো জংলি। ভুল করে মাঝে মাঝে শহরে থাকেন, এই যা।

ও। তাইলে তো ভালই।

—আজ আর সমুদ্রে চান করব না, বুঝলি। ক্লান্ত লাগছে।

—লাগবেই তো। কোনও ফিজিক্যাল মুভমেন্ট নেই। কিছুই না করে সমুদ্রের উপরে বসে থাকারও একটা ক্লান্তি তো আছেই। তার ওপরে যতই বড় দেখতে হোক তোর সেই লাল ফুটবলের মতো ফ্লোট-এর দিকে রোদ চিকচিক কালো জলের উপরে চেয়ে থাকাটাও কম ক্লান্তিকর নয়। আজ নাই-ই বা করলি চান, মানে, সমুদ্রে। বাথরুমেই কর।

—তোর এখানে জল আসে কোথা থেকে? মিষ্টি জল তো?

—হ্যাঁ। আন্দামানে অগণ্য দ্বীপ। এই দ্বীপপুঞ্জকেই বলে 'আন্দামান আইল্যান্ডস'। তবে খুব কম দ্বীপেই কিন্তু মিষ্টি জল আছে। আমাদের এই 'স্যান্ডপাইপার'-এ আছে। মিষ্টি জলের পুকুর আছে একটি। সেখান থেকে পাম্প করে ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল তোলা হয়। চান-হাত-মুখ ধোওয়া, চান করা, রান্নাবান্না সব এই জলেই হয়।

পাওয়ার আসে কোত্থেকে?

জেনারেটর আছে। মেইন আইল্যান্ড থেকে ত্রিশ নট তো পাওয়ার-এর লাইন টেনে আনা যায় না। মানে, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সরকার হলে পারত। মিষ্টি জল যে আছে এইই ঢের। এই জন্যেই তো এই দ্বীপের দাম নিয়েছিল অনেক।

কিনেছিলেন কে?

মিসেস রায়। বেঙ্গল ল্যাম্পের মালিকের স্ত্রী। অত্যন্তই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা ছিলেন।

—কতদিন আগে কিনেছিলেন উনি?

—তা আমাদের জন্মের সময় হবে। আরও আগেও হতে পারে।

—তা তুই এই দ্বীপের আর চাকরির খোঁজ পেলি কী করে? এরকম অড জব-এর?

—এই দ্বীপের কথা আগেই জানতাম। কারণ, বেঙ্গল ল্যাম্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর তপন রায় আর তাপস রায় আমার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তপন এক সময়ে ডুয়ার্সের একটা সাহেবি চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন। ডুয়ার্সের চা বাগানের অনেক সাহেব ম্যানেজারই আমার শিকারের বন্ধু ছিলেন। তাপস সম্ভবত এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি বেঙ্গল ল্যাম্পের ব্যাঙ্গালোরের কারখানাটি দেখতেন তাই তাঁর চেয়ে তপনের সঙ্গেই আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাপসের স্ত্রী ছিলেন ইংলিশ। নাম ছিল এলিজাবেথ। আর তপনের স্ত্রী ছিলেন ইজরায়েলি। নাম ছিল ভিওলেট। এলিজাবেথ ক্যানসারে মারা যাবার অনেকদিন পরে তাপস আবার বিয়ে করে একজন বাঙালি মেয়েকে।

তারপর বললাম, আমার তো কোনও পিছুটান ছিল না। সুযোগ পেলেই নতুন পরিবেশে নতুন কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ভেসে

পড়তাম। বাবা তো চলে গেছেন সেই কবে। মাও চলে গেলেন তাঁর খুব কম বয়সেই। ভাই বা দাদাতো নেই-ই। এক বোন। সেও তো বস্টনে সেটেলড। মা থাকতে বোন বছরে একবার করে আসত। মা চলে যাবার পরে আর আসে না।

কুন্নুরে একটি চা-বাগানে কাজ করেছিলাম বেশ কিছুদিন। তখন নীলগিরি হিলস-এ শিকারও করেছি অনেক। আমার এক বন্ধু ছিলেন উটিতে। উটির এখনকার নাম উধাগামন্ডলম্। পদবি ছিল বিসেন। আমার সেই বন্ধুর। ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। তখন রিটায়ার্ড।

কচি বলল, তোর কাছে একবার তো গিয়েওছিলাম আমি তখন। ভুলে মেরে দিয়েছিস। বিসেন সাহেব, আমি, আর তুই একটা দারুণ বাইসন মেরেছিলাম নীলগিরি হিলস-এ। মনে পড়েছে? পরে, সেই অঞ্চলই ভীরাপ্পান কান্ট্রি হয়ে গেছিল। তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকের। অনেকবার ভেবেছি জানিস, যে তোকে বগলদাবা করে একবার চন্দন-দস্যু ভীরাপ্পানের সঙ্গে টক্কর দিই।

—তোর এই সাধের কথা তো বলিসনি কখনও।

—না। বলিনি। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি আমাদের সকলেরই বয়স তো হয়েছে। এই বয়সে নীলগিরি হিলস-এ পায়ে হেঁটে পাহাড় চড়ে অত অ্যাডভেঞ্চার করা সম্ভব হত না তাই মনের বাসনা মনেই পুষে রেখেছিলাম।

কচি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যাই হোক, কুন্নুরের চা বাগানের চাকরির সঙ্গে আন্দামানের এই চাকরির কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক আর কী। যে বারে বম্বে থেকে গ্রাউজ-শুটিং-এ গেছিলাম তপন ও তাপসের সঙ্গে তখন ওঁরা দুজনেই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে এখানের কাজ ছেড়ে দেওয়ার পরই যদি আন্দামানে

একবার যাই এবং নিজচোখে সব দেখে শুনে আসি তাহলে খুব ভাল হয়। জায়গাটা এবং কাজটা পছন্দ হলে তারপরই মাইনে এবং অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে কথা বলা যাবে। সুব্রাহ্মনিয়ম বলে একজন তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণ এখন আছেন ম্যানেজার হিসেবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে আমাদের কাজ তো কিছু দেখেননি, উল্টে বে-আইনিভাবে গাছ কেটে এবং বেচে তিনি বহু লক্ষপতি হয়ে গেছেন।

ওরা বলল, আন্দামানের ওই প্ল্যানটেশান মায়ের চোখের মণি ছিল। তাই মায়ের অবর্তমানে আমাদের কর্তব্য ওই দ্বীপটি ঠিক ঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। আমি গিয়ে, দেখেশুনে ওদের সম্মতি দিলে তবেই ওঁরা সুব্রাহ্মনিয়মকে ছাড়িয়ে দেবেন এবং আমাকে বহাল করবেন।

তারপর?

তারপর আর কী? গেলাম, দেখলাম এবং এই দ্বীপটিকে আমার অবসরের জীবনের আশ্রম হিসেবে গ্রহণ করলাম।

—তোর বাহাদুরি আছে। নির্জনতা যে আমরা, মানে আমাদের শিকারের বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই ভালবাসি তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে এমন নির্জনতা। এবং এতদিন ভাবা যায় না।

বলেই বলল, কত দিন হল এখানে তোর?

ভুলে গেছি। এখানে ক্যালেন্ডারের কোনও দরকারই পড়ে না। তবে জোয়ার ভাঁটা জানার জন্যে পিএম বাগচির একটা পঞ্জিকা আছে জিতেনের কাছে। তাতেই আমাদের কাজ চলে যায়। প্রতিবছর পিএম বাগচি কোম্পানির মালিক জয়ন্ত বাগচি এক কপি আমাকে উপহার দেন পঞ্জিকা বেরোলেই। আমি যেখানেই থাকি না কেন।

তারপরই জিতেনকে ডাকলাম।

জিতেন এসে বলল, ছার?

—আমার এখানে কত দিন হল, বলতে পারো?

—হ্যাঁ ছার। আপনার যতদিন আমারও ততদিন। আগে তো শুনছিস একজন মাড্ডু আছিল।

বললাম, মাড্ডু আবার কী কথা। এরকম বলবে না। এবার এখানে আমার কত দিন হল, বলো তো সাহেবকে।

—হ্যাঁ। কইতাছি। এগজাক্টলি কম্যু?

হ্যাঁ। হ্যাঁ! তাই বল।

তিন বছর, সাত মাস তেরো দিন।

কচি জিতেনের কথার ধরনে হেসে উঠল।

তারপরে বলল, এবারে আমরা চানটা করে নিই। কী বল?

—চান কইর‍্যা উইঠ্যাই কি ভাত খাইবেন ছার? মদ খাইবেন না?

তপন রায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ কুন্নুরেই। তারও শিকারের শখ ছিল খুব। আগেই বলেছি, ওঁদের দুভাই-এর সঙ্গে বম্বে থেকে গ্রাউজ-শুটিং-এ গেছিলাম। বম্বেতে আমি গেছিলাম আমাদের অফিসের কাছে। তখনও রিটায়ার করার দেরি ছিল। ওঁরা এসেছিলেন বাঙ্গালোর থেকে কোম্পানির কাজে। তাজমহল হোটেলেই দেখা। আমরা সকলেই সেখানেই উঠেছিলাম। সেখান থেকে জবরদস্তি আমাকে নিয়ে গেছিলেন ওরা।

কচি কথা কেটে বলল, তুই সত্যিই সেনাইল হয়ে গেছিস। জিগ্যেস করেছিলাম এই স্যান্ডপাইপার-এর কথা। তুই কোথা থেকে কোথায় চলে এলি। সত্যি!

লজ্জিত হয়ে বললাম, ঠিকই বলেছিস। আজকাল এরকমই হয়। কথায় বলে না, বাহাত্তরে ধরেছে। তা পঁচাত্তর তো হয়েই গেল। বার্ধক্যের লক্ষণ তো আস্তে আস্তে প্রকট হবেই।

—তোর একারই নয়। আমারও এরকম হয়। এবারে বল।

—হ্যাঁ। ওই দ্বীপে আগের মালিক তামিলিয়ান মিস্টার ইয়েদুরাপ্পা নারকোল গাছের প্ল্যানটেশন করেছিলেন। সেই অবস্থাতেই মিসেস রায় দ্বীপটি কিনেছিলেন। লক্ষাধিক নারকোল গাছ ছিল। কিন্তু প্রজেক্টটা ইকনমিকালি ভায়াবল্ হল না। নারকোল দক্ষিণ ভারতে বা পূর্ব ভারতে জাহাজে করে রপ্তানি করার চেয়ে এখানেই 'কোপরা' করে সেগুলো রপ্তানি করলে খরচের সাশ্রয় হত। তা করাও হয়েছিল নাকি কিছুদিন। কিন্তু এই দ্বীপ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে নারকোল নিয়ে গিয়ে কোপরা বানিয়ে তারপরে তা পাঠাতে হত কলকাতা বা ম্যাড্রাসে।

—কেন? এই দ্বীপেই কোপরা বানানো যেত না?

—এখানে লেবার কোথায়? মেইনল্যান্ড থেকে লেবার এনে তাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে তাদের মজুরি দিয়ে খরচে পোষাত না। সেই সময়ে মিসেস রায় ওই দ্বীপের খোঁজ পেয়ে কিনে নেন। কিনে নেবার পরও সেই একই অসুবিধে হল। তারপরে একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া এল তাঁর মাথাতে। এই দ্বীপে অনেক সুইফটলেট পাখি এমনিতেই ছিল। সুইফটলেট পাখির এভিয়ারি করে ঐ পাখির বাসা (বার্ড জেস্টস সুপ) মেইনল্যান্ড চায় না, বার্মা, থাইল্যান্ড ইত্যাদি জায়গাতে রপ্তানি করবেন ঠিক করলেন। সেই আইডিয়াটা ইমপ্লিমেন্টও করলেন। তাছাড়া, আরও একটা জিনিস আমরা এক্সপোর্ট করি এখান থেকে।

কী?

জিতেন আবার বলল, মদ খাইবেন না?

বলব পরে।

কচি জিতেনের কথাতে হেসে উঠল।

বলল, অনেকদিন পরে 'মদ' শব্দটা শুনলাম। বুঝেছিস।

তারপর বলল, কী আছে তোমার কাছে জিতেন?

মদ ছার?

হ্যাঁ। কিন্তু কী?

হুইসকি। সাদা ঘোড়া আছে ছার। আর কিছু নাই।

আমি বললাম, যা আছে তাতে ক'দিন চলবে জিতেন?

—কচি ছার কেমন খাইবেন স্যাতো জানা নাই আমার।

—কেমন আর খাইবেন? ভদ্রলোকে যেমন খান তেমনই খাইবেন।

আমি বললাম বিরক্তির গলায়।

কচি বলল, তোমার চিন্তা নেই জিতেন। আমি সঙ্গে করে প্রচুর স্টক নিয়ে এসেছি। আমি চলে যাওয়ার পরেও তোমার ছার-এর জন্যে থাকবে।

তারপরে বলল, তোর জন্যে সিংগল-মল্ট হুইস্কি নিয়ে এসেছি রে বুড়ো। কতদিন বনজঙ্গলে বসে হুইস্কি খাই না দু'জনে। গোপাল তো চলেই গেল, ফুটুদা, এবি কাকু, চাঁদুবাবু তো খেলেও সামান্যই খেতেন, সুব্রত তো কোনওদিনই বিশেষ খায়নি। খেতোই না। সিগারেটই তো ছিল সুব্রতর একমাত্র নেশা।

কচি বলল, সুব্রতর কথা তো বললি না, আমিও জিগগেস করতে ভুলে গেছিলাম। ওর রিসেন্ট খবর কী?

সুব্রতও নেই। ব্লাড ক্যানসার হয়েছিল। খুবই চাপা ছেলে ছিল। কথা চিরদিনই কম বলত। কষ্টর কথা প্রকাশ করতই না। পার্ক স্ট্রিটের ক্রিশ্চান মিশনারি হাসপাতালে ছিল শেষের ক'দিন। হঠাৎ ফোন পেলাম। তবে দুটি মেয়েরই ভাল বিয়ে দিয়ে গেছে এবং ছেলেটিও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তার নাম ঋজু চ্যাটার্জি। চার্টার্ড

অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আইটিসি না কোথায় যেন আছে। দিল্লিতে পোস্টেড ছিল, একবার দেখা হয়েছিল সেখানে। এখন কোথায় তা বলতে পারব না।

কী ব্যাপার রে? এ যে মড়ক লাগল দেখছি।

সেরকমই অবস্থা।

তারপর বললাম, সুব্রতর স্ত্রী অলকা কলকাতাতেই থাকে। মুজাফ্‌ফরপুরের মেয়ে অলকা। সুব্রতর বিয়ের পরে হাজারিবাগে ওদের বাড়ির কম্পাউন্ডে ইউক্যালিপটাস গাছেদের পাশে পাশে দিল্লিওয়ালা সামিয়ানা খাটিয়ে জোর খানাপিনা হয়েছিল এক প্রচণ্ড শীতের রাতে—বৌভাতে। পরদিন বাস ভাড়া করে ওদের বাড়িশুদ্ধ এবং আমরা সকলে রাতে রাজডেরোয়াতে ন্যাশানাল পার্কে গেছিলাম শীতে কাঁপতে কাঁপতে।

—সে বৌভাতেও আমি গেছিলাম রে। তোর মনে নেই? আমার স্পষ্ট মনে আছে। সত্যি! কী করে সময় যায়। বোঝাই যায় না।

—গোপাল বরযাত্রী গেছিল। তখনও হাজারিবাগেই ছিল। তোষক আর লেপ-শুদ্ধ সুব্রতর চেলা-চামুণ্ডারা জবরদস্তি সাতসকালে ওকে ছিনতাই করে তুলে নিয়ে মুজাফ্‌ফরপুরে চলে গেছিল। সে কী কাণ্ড! আমি যেতে পারিনি বরযাত্রী। কলকাতাতে অফিসের খুব জরুরি কাজ পড়ে গেছিল।

আমি গেছিলাম। মনে আছে।

কচি বলল।

তারপরে বললাম, এবারে চানে যা। এখানে কিন্তু গিজার বাথরুমে। তবে সমুদ্রতীরে ঠান্ডা কখনওই তেমন পড়ে না।

—আরেকটা কথা। কচি, আমি কিন্তু মল্ট-হুইস্কি খেতে পারি না।

—সে কি রে? গ্লেনমোরেন। গ্লেনফিডিশ। লোকে যে হামলে পড়ে যায়।

—তা খেতে পারে কিন্তু আমার ভাল লাগে না। এনি স্কচ ইজ গুড এনাফ ফর মি। তাছাড়া, আজকাল খেতেই ভাল লাগে না। এখন দোকান বন্ধ করার সময় হয়েছে। বুঝলি না?

"সব কিছুরই একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ।"

কচি বলল, "গান থামিলে তাইত কানে থাকে গানের রেশ।"

আমি বললাম, "জীবন আস্ত যায় চলি তার রংটি থাকে লেগে।"

কচি বলল, "প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎসন্ধ্যা মেঘে।"

তারওপরে দু'জনে একসঙ্গে বললাম,

"নিজেরে আজ কহো যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

—আমি চানে গেলাম। বলে, কচি চান-ঘরের দরজা বন্ধ করল।

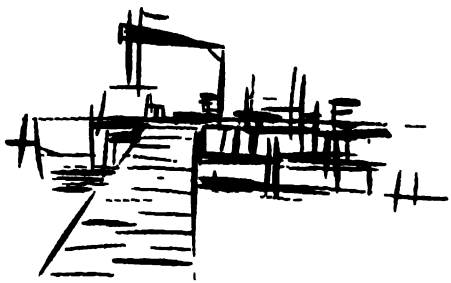

বুড়ো বলল, ম্যাকলাস্কিগঞ্জে কি আর একবারেই যাস না? তুই তো একটা বাড়িও করেছিলি সেখানে।

বাড়ি করিনি। ম্যাকলাস্কিগঞ্জে নিজে বাড়ি করে কম মানুষকেই থাকতে দেখেছি। বাড়ি বলতে আমরা যা বুঝি তেমন বাড়ি কমই আছে। সবাই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেবদের বানানো বাংলা। ছোট বড় কটেজ। ফায়ারপ্লেস আর চিমনিওয়ালা। এক একটি বাড়ির সঙ্গে দশ-বিশ বিঘা জায়গা। তার কিছুটা বাগান আর অনেকাংশই ফাঁকা। আজকালকার যুগে অভাবনীয়।

—তোর বাংলোর মালির কুকুরকে নাকি লেপার্ড-এ নিয়ে গেছিল?

—নিয়েছিলই তো। তবে আজকের কথা তো নয়, সত্তর দশকের গোড়ার দিকের কথা। তখন সবে কটেজটি কিনেছি। আহা! সে তো কটেজ নয়, একটি স্বপ্ন।

—তাহলে নিজেই সেই স্বপ্নভঙ্গ করলি কেন?

—যত সুন্দরই হোক না কেন, দূরের কোনো জায়গাতে বাড়ি

করলেই থিতু হতে ইচ্ছে করে আর থিতু হলেই যে বাঁধা পড়ে যেতে হয়। কোনো নারীকেও যেমন বেশিদিন ভালবাসতে নেই, কোনো জায়গাতেও বেশিদিন থাকতে নেই। বেশিদিন থাকলেই সে জায়গাতে বদ্ধ হয়ে যেতে হয় আর কোনোরকম বাঁধনেই বাঁধা পড়া যে আমার চরিত্রে নেই।

—ও বাংলো কিনেছিলি কার কাছ থেকে?

—এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে। তিনি আসানসোলের কাছের এক কলিয়ারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের বয়স হয়নি। চাকরি কেন ছেড়েছিলেন বা চাকরি চলে গেছিল কি না, তা বলতে পারব না কিন্তু কলিয়ারি ছেড়ে ম্যাকলাস্কিতে তাঁর শ্বশুরের বানানো বাংলোতে চলে এসেছিলেন সস্ত্রীক। ছেলেমেয়ে তাঁর ছিল না। শ্বশুরকে আমি চোখে দেখিনি। তাঁর নাম ছিল মিস্টার কাব্রাল। শ্বশুর মারা যাবার পরই তিনি ম্যাকলাস্কিতে চলে আসেন। কাব্রাল সাহেব খুব উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন।

কেন? উদ্‌যোগী বলছিস কেন?

বলছি এই জন্যে যে, বাংলোর তিনদিক দিয়ে একট পাহাড়ী ঝোরা ছিল সীমানা চিহ্নিত করে। বর্ষাকালে ঝোরা দিয়ে যখন অনেক জল বয়ে যেত তখন তা বাংলোর নিচু জায়গা প্লাবিত করে দিত। সেই জায়গাতে কাব্রাল সাহেব ধান এবং আখের চাষ করতেন। যেবারে আখ ভাল হতো সেবারে সেই আখ থেকে আঁখি গুড় করে তা বিক্রি করে দিতেন তিনি। ওঁর মালী মহুয়া ফারমেন্ট করে মহুয়ার মদও তৈরি করত। জানি না সেটাও কাব্রাল সাহেবের সঙ্গে জয়েন্ট-ভেঞ্চার ছিল কি না।

কাব্রাল সাহেবকে আমি চোখে দেখিনি কিন্তু এ বাংলো আমি তাঁর জামাইএর কাছ থেকে কেনার পরে স্থানীয় মানুষদের মুখে শুনেছিলাম

যে ম্যাকলাস্কি রেল স্টেশনের সমতলভূমির উচ্চতার প্লাটফর্মে রাতের বেলা তাঁকে নাকি প্রায়ই দেখা যেত পায়চারি করতে, নিজের মুণ্ডুটিকে বগলদাবা করে। অশিক্ষিত ওরাওঁ আর অর্ধশিক্ষিত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের বাসভূমি এই জঙ্গল পাহাড় ঘেরা ম্যাকলাস্কিগঞ্জে এমন কত গল্প যে চালু ছিল তা বলার নয়।

সেখানে একজন রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার স্টিভেন্স। স্থানীয় ওরাওঁরা 'ব্রিগেডিয়ার' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারত না, ওরা বলত 'বিগারিও' সাহাব। প্যাট গ্লাসকিন নামের এক ল্যাংড়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিলেন, মিসেস ডাগানের বাড়ির কেয়ারটেকার, তাকে ওরা উল্লেখ করতে 'ল্যাংড়া গ্লাসকিন' বলে। আমার বাংলোর উল্টোদিকে এক অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি থাকতেন। তাঁদের দুজনেরই বয়স ছিল নব্বুই-এর উপরে। তাঁদের পদবি ছিল 'হল্যান্ড'। ওরা মিস্টার হল্যান্ডকে উল্লেখ করত 'হলান্ডুয়া' বলে। হল্যান্ড সাহেব যৌবনে ভাল শিকারিও ছিলেন। স্থানীয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা বলতেন উনি নাকি মানুষ খুন করে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার হয়ে ভারতে চলে আসেন। মনে হয়, বানানো গল্প। আমার বাংলোর কাছেই সুন্দরী মিসেস কিং-এর বাংলোর সামনে একটি বাজ পড়া শিমুলগাছে বসে উনি একটি মস্ত লেপার্ড মেরেছিলেন, আমি বাংলো কেনার দু বছর আগে।

প্যাট গ্লাসকিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অ্যাম্বুল্যান্সের ড্রাইভার ছিলেন। বার্মা বা মালয়ে কনভয়ের উপরে জাপানি যুদ্ধ-বিমানের হামলাতে কনভয়ের সব কটি ভ্যানই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। প্যাটের ডান পা-টা হাঁটুর উপর থেকে কাটা যায় আর্মি হাসপাতালে।

তারপর কচি বলল, প্যাট গ্লাসকিন মহুয়া "ডক্টর" করে দারুণ মদ বানাতে পারত।

কী করে?

একটি তাওয়াতে চিনি আর লবঙ্গ লাল করে পুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো মহুয়ার বোতলে ফেলে দিয়ে ঝাঁকালে তার রং হুইস্কির মতো হয়ে যেত। আর খেতেও চমৎকার। আহা! আহা! করে খেত লোকে।

তারপর কচি বলল, তুই তো জানিস নিশ্চয়ই, অ্যামেরিকান নোবেল-লরিয়েট নভেলিস্ট আর্নেস্ট হেমিংওয়েও স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার-এ অ্যাম্বুল্যান্স ড্রাইভার ছিলেন এবং তাঁরও একটি পা প্রায় কাটা যেতে যেতে বেঁচে যায়। সেই হাসপাতালে 'অ্যাগনেস' নামের একটি সুন্দরী যুবতী নার্স এর সঙ্গে হেমিংওয়ের প্রেম হয়ে যায় এবং এই প্রেমোপাখ্যান নিয়ে একাধিক ভাল ফিল্মও হয়েছে। জানি না, তুই দেখেছিস কি না।

আমি বললাম, না। আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে আমার মনে হয় তুইও একজন হেমিংওয়ে।

কচি বলল, ঠাট্টা করছিস?

ঠাট্টা কেন করব। তোর সঙ্গে হেমিংওয়ের যে অনেকই মিল। হেমিংওয়ে বিগ-গেম হান্টিং করতেন, ডিপ-সী ফিশিং করতেন, রমণীসঙ্গ এবং মদ্যপানে বাহাদুর ছিলেন। প্রতি বছর জুন-জলাই মাসে তিনি জার্মান-ইস্ট-আফ্রিকাতে (এখন তানজানিয়া) দেড়-দু মাস সাফারি করতেন পৃথিবী বিখ্যাত পেশাদার শিকারিদের সঙ্গে নিয়ে। ওঁর নিজের একটি ডিপ-সী ফিশিং-এর জন্যে ট্রলার ছিল। কিউবাতে একটি বাড়ি ছিল, তার নাম "দ্যা ফিন্‌কা-ভিজিয়া"। স্টেটস এর আইডাহোর কেচাম্ এ স্নেক নদীর পাশের পাহাড়ের উপরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি চমৎকার বাংলো ছিল, যার নাম ছিল 'দ্যা টলিং-হাউস'। ঐ বাড়িতেই তিনি পঞ্চাশে আত্মহত্যা করেন।

সত্যি। তুই কত কী জানিস রে বুড়ো।

ঠাট্টা করিস না।

এই প্রেক্ষিতে তোকে একটা কথা বলি।

কী কথা?

হেমিংওয়ের সঙ্গে আমার আরও একটা মিল আছে।

কী মিল?

আমারও খুব আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। প্রায়ই।

বালাই-ষাট।

তবে হেমিংওয়ে তো আমার চেয়ে অনেক কম বয়সে আত্মহত্যা করে ছিলেন। সেই গাঁট তো আমি পেরিয়ে এসেছি।

আমি হেসে বললাম, তাহলে আর দুশ্চিন্তা কীসের?

তারপর বললাম, আচ্ছা, হেমিংওয়ের মতো এতো সফল মানুষ কোন দুঃখে আত্মহত্যা করলেন, বলতে পারিস?

—ফ্রাস্টেশান, অবসাদ এ সব কি শুধুমাত্র অসফল মানুষদেরই থাকে? সাফল্যও ব্যর্থতারই মতো মানুষকে ফ্রাস্ট্রেট করে। এ কথা যে কত বড় সত্যি তা তুই যে-কোনো সাকসেসফুল মানুষকে জিগ্গেস করে দেখিস।

হেমিংওয়ে সম্বন্ধে হেমিংওয়ের বন্ধু এ.ই.হচনার এর লেখা একটি বই আছে। নাম হচ্ছে 'পাপা হেমিংওয়ে'।

পড়েছিস কি?

না তো।

পারলে, পড়িস। নানা তথ্য তো আছেই, তার উপরে একেবারে হিলারিয়াস বই। এমন এমন সব ঘটনার কথা উনি উল্লেখ করেছেন যা পড়লে হাসতে হাসটে পেট ফাটে। তাছাড়া, মানুষটার চরিত্রের বিভিন্ন

দিক সম্বন্ধে জানাও যায়। ঐ বইয়েতেই তিনি শেষে এসে হেমিংওয়েকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, হেমিংওয়ের আত্মহত্যার আগে যে "এই জীবন আর টেনে নিয়ে লাভ কী? জীবন কি শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে? যদি আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শিকারেই না যেতে পারি, যদি বন্ধুদের সঙ্গে যথেচ্ছ খাওয়া-দাওয়া না করতে পারি, যদি হুল্লোড় করে মদ্যপান না করতে পারি, যদি বিছানাতে কোনো নারীকে সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে না পারি, তাহলে এই ছাতার জীবন রেখে লাভ কী, এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।"

আসলে যে সব মানুষ পুর্ণ জীবনযাপন করেছেন, করতে চান, তাঁদের কাকস্নানে মন ভরে না। সেই খণ্ড জীবন তাঁদের কাছে ভগ্নজীবন, তেমন জীবন, বাঁচা না-বাঁচাতে কোনো তফাত নেই।

—বলেছিস ঠিকই। তবে আত্মহত্যা করতেও তো সাহস লাগে। আমার তো সেই সাহসটুকুও নেই। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে আত্মহত্যা মহাপাপ।

—পাপ নয় কি?

—অনেকেই তা মনে করেন না। পৃথিবী বিখ্যাত ইতালিয়ান চিত্রপরিচালক আন্তোনিওনির দর্শন অন্যরকম ছিল।

কী রকম? আমি চলচ্চিত্র জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ জানি না। আন্তোনিওনি কোন কোন ছবি করেছিলেন?

—আরে করেছিলেন তো অনেক ছবিই, তবে তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি 'লা ডল্‌সে ভিটা'। আন্তোনিওনির জীবন-দর্শন ছিল 'জীবন যদি মানুষকে ঈশ্বরের দানই হয় তবে সেই জীবন নিভিয়ে দেবার ক্ষমতাও ঈশ্বর নিশ্চয়ই মানুষকে দিয়েছেন।'

মৃত্যু সম্বন্ধে আন্তোনিওনির একটা অবসেশান ছিল, বুঝেছিস বুড়ো।

কেন একথা বলছিস?

আন্তোনিওনির অধিকাংশ ছবির নায়ক-নায়িকারাই আত্মহত্যা করে মারা যেত। তাঁর ছবির ডায়ালগ ছিল অত্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক। পুরো মানুষটি আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। টেনিস খেলতেন, সাঁতার কাটতেন, জীবনের সঙ্গে কুস্তি লড়তেন, অথচ সেই মানুষই কত সহজে জীবনের কাছে হেরে গিয়ে আত্মহত্যা করাতেন তাঁর সব দেদীপ্যমান নায়ক-নায়িকাদের।

—উনি নিজে কি আত্মহত্যা করেছিলেন? কই তেমন তো শুনিনি।

—মৃত্যু যে কখন আসে তা তো আগে থাকতে জানা যায় না। কে বলতে পারে! আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো সত্যি সত্যি নিজেও আত্মহত্যা করতেন, কে বলতে পারে!

তারপরে বলল, শরীর আর মনকে আলাদা করে ফেলতে পারলে আর কোনো ঝামেলা নেই।

—তা কি সকলে করতে পারে। বলা সহজ। করা অত সহজ নয়।

—আমি একজনকে জানতাম, তিনি পেরেছিলেন।

—কে?

—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উনি এক সময়ে কোল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় ছিল সংগীতজ্ঞ হিসেবে। শুধু সংগীতজ্ঞ নয়, সংগীত সমালোচক, লেখক, রসিক। পূর্ণ একজন মানুষ। সম্ভ্রান্ত মানুষ। কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন যদিও তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছর আগে। আমার সঙ্গে আলাপের কিছুদিন পরই তিনি দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হন। কিন্তু চরম অসুস্থ

অবস্থাতেও তাঁকে কখনও ক্লান্ত, বিরক্ত বা তিক্ত হতে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে টালিগঞ্জের আই.টি.সির সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির একটি সেমিনারে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেমিনারের আগের দিন বম্বে, দিল্লি এবং অন্যান্য জায়গা থেকে বাঘা-বাঘা সংগীতশিল্পীরা, সংগীত সমালোচকেরা এসেছিলেন একটি ককটেইল পার্টিতে। অরবিন্দ রাণাডে, অরবিন্দ পারেখ, কাশীনাথ মুখার্জি, অশ্বিনী ভিদে দেশপাণ্ডে, শ্রুতি সাডোলিকার, বিজয় কিচলু ইত্যাদি। এস. আর এর ফ্যাকাল্টিরা তো ছিলেনই। কুমারদাও আমন্ত্রিত ছিলেন।

আর ততদিনে অনেকেই জেনে গেছেন যে কুমারদা অত্যন্ত অসুস্থ, ক্যানসারাক্রান্ত। আমার সামনেই অনেকেই জিগ্যেস করলেন, কুমারদা যেমন আছেন?

কুমারদা সেদিনও হুইস্কি খেয়েছিলেন। হুইস্কি খেতে খুব ভালবাসতেন তবে কখনও বেসামাল হতে দেখিনি। নানা প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তরে কুমারদা বললেন, আমি তো ভালই আছি ভাই। কিন্তু শরীরটাই বড় গড়বড় করছে।

বাক্যটি শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। মৃত্যুর দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে এমন করে তাকে উপহাস করতে বেশি মানুষকে দেখিনি।

কুমারদা প্রায়ই বলতেন, লোকে স্কচ হুইস্কি কেন বলে বলো তো? হুইস্কি কি স্কচ ছাড়া হয় না কি?

তারপরই কচি বলল, তুই কুমারদার 'কুদরত রঙ্গবিরঙ্গী' বইটা কি পড়েছিস বুড়ো? দেশ এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল?

—'দেশ' আমি বহুদিন রাখা বন্ধ করে দিয়েছি। সেই 'দেশ' আর নেই। দেও ও নেই। তাছাড়া, এখানে তো দেশ পাইই না।

—ইদানীংকার কথা নয়। ঐ লেখা বেশ কিছুদিন আগে অনেকদিন ধরে 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সাগরময় ঘোষ এর আমলে।

কুমারদা যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন প্রায়ই আমাকে ডাকতেন, বলতেন, চলে এসো। যতক্ষণ হুইস্কি খাই ততক্ষণই একটু ভাল বোধ করি।

উনি তো খাওয়াতেনই আমিও মাঝে মাঝে ওঁর জন্যে নিয়ে যেতাম। এক সন্ধেতে একটি 'রয়্যাল স্যালুট' নিয়ে গেছিলাম। উনি বললেন, ওটা পরে খুলব এখন। আপাতত আমার কাছে যা আছে তাই খাও।

পরদিন সকালে ফোন করে বললেন, তুমি করেছ কী? অপাত্রে এমন দান। রয়্যাল স্যালুট। কাল রাতেও বুঝতে পারিনি কী নিয়ে এসেছ। ও জিনিস আমি একা খেতে পারব না তুমি আজই সন্ধেতে এসো। আমার সময় তো আর বেশি বাকি নেই। এসো, এসো। আটটার সময়ে চলে এসো।

কুমারদার সঙ্গে একটি আশ্চর্য অসমবয়সী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিছু কিছু মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে পৃথিবীটা ভীষণরকম গরিব হয়ে যায় আবার কিছু মানুষ চলে গেলে পৃথিবী যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এটাও সত্যি।

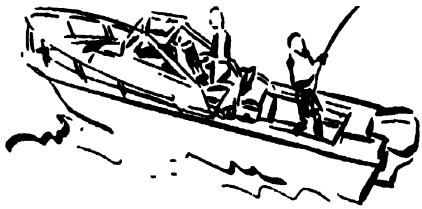

আজও সমুদ্রে স্নান হল না। কাল সকালে করবই।

বলল কচি।

—করবি এখন। সমুদ্র তো পালাচ্ছে না।

—তা ঠিক। তাছাড়া, সকালে তুই যত গাছ দেখালি সেগুলোই হজম করি আগে। গাছ ছাড়াও কতরকম সামুদ্রিক মাছের খবর দিলি। আজ রাতে সব লিখে রাখব ডায়ারিতে। আজকাল স্মৃতি আর আগের মতো নেই। সবই ভুলে যাই।

—একদিন গিয়েই তোর সমুদ্রে মাছ ধরার সখ উবে গেল?

আর যাবি না?

—যাব, যাব। আগে একটু আত্মস্থ হয়ে নিই। এখানের সব মাছেদের আগে চিনি। স্যামন, সুরমেই, সিয়ার, টুনা, কোরেই, ম্যাকারেল, সিলভার বেলিজ, ম্যানে, রুপোলি পেটের মাছ। সার্ডিনস তো বললি এখানে দু'রকম আছে।

—হয়ত আরও অনেক রকম আছে। আমি কি আর সব চিনি। আর কী কী আছে বললি যেন?

—হারেমগুলা, ডুসুমেরিয়া অ্যাকুা, রেজ, বারাকুডা, মুলেট, জেলিফিশ, নানারকমের অক্টোপাস, ছোটগুলো খেতে ভাল। শামুক, জার্মানিতে যাদের বলে মুশেলস্। জার্মানিতে স্যামন মাছকে বলে 'ফোরেলো'। ফ্রাঙ্কফুটের কাছে জঙ্গল ভরা পাহাড়ের নীচে একটি ছোট নদীর পারে ছবির মতো রেস্তোরাঁতে স্যামন মাছ ভাজা খেয়েছিলাম। সেই নদীতে টাটকা ধরা মাছ। গরমগরম ভেজে দিচ্ছিল। দারুণ স্বাদ। আর জায়গাটার নামই মনে পড়ছে না কিছুতেই।

—বুড়ো হলে এরকম হয়।

—কোথায় উঠেছিলি ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ?

—একটা ছোট হোটেলে। পৃথিবী খ্যাত ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ারে গেছিলাম। সনটাও ভুলে গেছি। সম্ভবত ১৯২৯। জার্মানরা বলে "বুক মেসসে।"

—ওখানে সৌরদীপ ছিল না? আমি তো জার্মানিতে বারবার গেছি। সৌরদীপ খুব দেখাশোনা করত।

—তুই ওকে মিট করিসনি?

—করিনি? ওর কেরালাইট স্ত্রী ছিলেন একটি লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। খুব মজা হত। খাওয়া-দাওয়া গল্প গান। বাংলা আধুনিক গানের খুব ভক্ত ছিল ও। ওদের একটিই সন্তান ছিল ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে। ধুৎতেরি! তার নামও মনে পড়ছে না। স্ত্রীর নাম মনে পড়েছে। নলিনী। বহুবছর যোগাযোগ নেই। সৌরদীপ ভারতে এসে কলকাতায় দু'একদিন থেকেই নলিনীর সঙ্গে কেরালাতে চলে যেত। সৌরদীপ-এর পেশা ঠিক কী যে ছিল তা বুঝতে পারতাম না। সে ব্যাপারে একটু ধোঁয়াশা ছিল। নলিনীকেও জিগগেস করিনি কখনও।

—ওরা আছে কেমন? খবর রাখিস নাকি?

—শুনেছি, মারা গেছে। আর ওর মৃত্যুর পরে জানতে পারলাম ও কী করত।

—কী করত?

—ও মেল প্রস্টিট্যুট ছিল। জার্মান বুড়িগুলো প্রচণ্ড বড়লোক আর প্রচণ্ড কামুক। জার্মানিতে এটা নাকি একটা দারুণ প্রফেশান।

বললাম, হবে। 'বিপুলা ও পৃথিবীর কতটুকু জানি।' বলিস কী রে। এই সত্যটা হজম করা একটু মুশকিল।

—শুঁটকি মাছ অবলীলায় হজম করে ফেলছিস আর এই সত্যটা হজম করতে পারবি না? তবে, সৌরদীপকে খুবই মিস করব আবারও যদি কখনও যাই জার্মানিতে। আমাদের খুবই যত্ন আত্তি করত কিন্তু। আর ওর প্রচণ্ড জীবনীশক্তি ছিল।

—ছিল বলেইতো জার্মান বুড়িরা ওর অত কদর করত।

কচি বলল।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। সৌরদীপের কথাই ভাবছিলাম।

—সকালে তো গাছ দেখালি অনেকরকম, সকলের নাম তো বললি না। যা বলেছিলি, তাও ভুলে গেছি।

একটু চুপ করে থেকে সৌরদীপের প্রসঙ্গ থেকে মনটাকে ফিরিয়ে এনে বলালম, এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সবশুদ্ধ প্রায় দুশো প্রজাতির গাছ আছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই Endemic। আমাদের এই দ্বীপেই তো প্রায় পঞ্চাশ রকমের গাছ আছে। এখানে চিরহরিৎ গাছই বেশি। পর্ণমোচীও আছে। এখানের নারকোল বা সেগুন কিন্তু ভারতবর্ষের মেইনল্যান্ড থেকে এনে লাগানো হয়েছে।

পর্ণমোচী মানে কী?

আরে ইংরেজি ডিসিডুয়াস। Evergreen বা চিরহরিৎ-এর উল্টো।

কালো-পিঠ সাদা-বুকের এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল দ্বীপের ভিতরে।

বললাম, ঐ দ্যাখ সুইফ্‌টলেট। টু বি প্রিসাইজ ইন্ডিয়ান সুইফ্‌টলেট। আকাশে যখন দল বেঁধে ওড়ে তখন ওদের মনে হয় বগারি পাখির ঝাঁক।

ওদের বাসা বানায় কখন ওরা?

—মার্চ-এ বানায়। মার্চ থেকে জুন অবধি থাকে। এরই মধ্যে আমরা ভেঙে নিয়ে নিই। যে গাছগুলোর ওপর দিয়ে ওরা উড়ে গেল সে গাছগুলো সব হার্ডউড। নাম বাদাম। বাদাম ভাজা খাওয়ার বাদাম নয় কিন্তু।

আমরা আমাদের কটেজ থেকে একশ মিটার দূরে একটি সিমেন্ট বাঁধানো বেদি মতো আছে সেখানে বসে বিকেলে কাঁটালের বীচি ভাজা আর মুড়ি দিয়ে চা খেয়েছিলাম। তেল-কই আর ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়িটা দারুণ রেঁধেছিল জিতেন। আমার মা এইরকম করে রাঁধতেন। আমার মা আর ঠাকুমা তিন বছরের ব্যবধানে মারা যাওয়াতে খাওয়া-দাওয়ার সুখ চলে গেছে বহুদিন। বিয়েই করিনি তাই আমার বউয়ের রান্না খাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু খাদ্য-বিলাসী রয়েই গেছি। গোপাল ছিল আরেকজন খাদ্যবিলাসী। গোপালের মা, আমাদের অত্যন্ত সৌখিন মাসিমা, দেশি-বিদেশি সব রান্না করতেন চমৎকার। টাকা অনেকেরই থাকে কিন্তু রহিসি শুধুমাত্র টাকা থাকলেই হয় না। হাজারিবাগে দেখেছি, সন্ধের পরে মেসোমশাই হুইস্কি খাবেন বলে মাসিমা বিকেল থেকে পরম যত্নে নিজে হাতে চিকেন কাটলেট বানাতেন। কোনও কোনওদিন মাংসর চপ। আমরাও প্রসাদ পেতাম। স্কচ ছাড়া খেতেন না কখনওই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর একমাত্র

সন্তান কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আমাদের কুমারদা, বলতেন, আচ্ছা বুড়ো, লোকে 'স্কচ হুইস্কি' বলে কেন বলতে পারো? হুইস্কি আবার স্কচ ছাড়া হয় না কি?

নাজিম সাহেবের চেলাগিরি করে গোপাল মুসলমানি খানার একজন কনৌসিয়ার হয়ে উঠেছিল। আতরের। গান-বাজনার। বিশেষ করে ঠুংরি ও গজলের। গোপালেরই উৎসাগে ওর ট্রায়াম্ফ গাড়িতে মহাজাতি সদনের বাইরে বসে সারা রাত গান-বাজনা শুনতাম আমরা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

তারপর বললাম, এই দ্বীপের জীবনে গান-বাজনা খুব মিস করি। জেনারেটরে ডেলিকেট মিউজিক সিস্টেম অচল। জিতেনের ট্রানজিস্টরে আকাশবাণীতে কখনও ভাল গান-বাজনা হলে ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে শুনি। এখন ধীরে ধীরে সবকিছুকেই এক এক করে ছাড়তে হচ্ছে। 'আমার যাবার সময় হলো, আমায় কেন রাখিস ধরে' ঋতু গুহর গলায় এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটা আমার বড় প্রিয় গান। সব প্রিয় জিনিসই ছেড়ে যেতে হবে। ছেড়ে যাওয়াটাও একটা আর্ট। ছেড়ে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে। "দুয়ারটুকু পার হতে" সংশয় যাতে না থাকে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হচ্ছি। ওপারে যাবার ভয় কাটিয়ে উঠছি। রাজহাঁস যখন তট ছেড়ে জলে নামে, তখন যেমন হালকা ঢেউ ওঠে নদীর জলে—কোনো আলোড়ন ওঠে না—যাওয়ার সময়ও অমনি আলতোভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেন যেতে পারি, এই প্রার্থনা।

—বুড়ো, এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চল আমার সঙ্গে থাকবি কিছুদিন। তুই সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস।

তারপর বলল, কী রে! চুপ মেরে গেলি কেন? গাছেদের নামগুলো বল।

—বলছি।

—কচি, এত জেনে কী করবি? জানার একটা বয়স থাকে। এখন ভোলার বেলা। যা জেনেছিলাম, যা কিছুকে ভালবেসেছিলাম, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, নারী, সবই একে একে ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরি হবার সময় এখন।

—ছাড় তো। তোর মধ্যে এমন মৃত্যুচিন্তা এসেছে কেন? আগে তো কখনও দেখিনি।

—বলতে পারব না। আগে মৃত্যু হয়তো এত কাছে আসেনি। এখন তো তার পদশব্দ শুনতে পাই সকাল বিকেল। সবই থাকবে, এই রোদ, চাঁদ, সমুদ্র, গাছগাছালি, পাখি। শুধু আমিই থাকব না। এইটা মনে হলেই মন একটু খারাপ হয় বৈকি।

কচি ডাকল, জিতেন।

বাবুর্চিখানা থেকে জিতেন সাড়া দিল। ছার।

—চাঁদ তো উঠে পড়েছে। দেখো, সমুদ্রের জলে লক্ষ লক্ষ রুপোলি সাপ খেলা করছে। একটা ট্রেতে করে দু'টি গেলাস, এক বোতল জল, আর আমার হুইস্কির বোতলটা এনে দাও বাবা।

—আমারটাও এনো। সাদা ঘোড়া। আমি বললাম।

তারপরে বলল, রাতে কি রাঁধছ?

—ভুনি খিচুড়ি আর অক্টোপাস ভাজা।

বলো কী? —বাঃ অক্টোপাস কখনও খাইনি। কাল দুপুরে কাঁকড়ার চচ্চড়ি কোরো তো—খুব ঝাল করে। আর সিংগি মাছের মাখা মাখা তরকারি রেঁধো, কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে আর বেগুন দিয়ে। বুঝেছ। কাল সমুদ্রে সাঁতার কাটব। খুব খিদে পাবে। তারপর দুটো ভোদকা খেয়ে জমিয়ে ভাত খেয়ে ঘুম লাগাব জোর।

—ঠিক আছে ছার।

আমি চুপ করে বসে ভাবছিলাম কচির খিদে মরেনি কোনও কিছুরই। তবে অনিলের মতো নয় ও। সব কিছুই হামলে পড়ে খেতে চায় না, পেতে চায় না। পরিমাণেও বেশি খায় না। ওর পরিমিতি জ্ঞান আছে।

কই? গাছের নামগুলো বল?

বাদামগাছের কথা তোকে বলেছি। হার্ড উড। আরও আছে সাদা চুগলাস, টঙপিন, লাল ধূপ, সমুদ্র—মওহা।

মওহা মানে কি মহুয়া?

হতে পারে। এখানে হয়তো নামের উচ্চারণ বদলে গেছে। গাছের চেহারাও বদলে যায় দেশ ভেদে, রাজ্য ভেদেও। বাংলা বা আসামের সেগুন, মধ্যপ্রদেশ বা মণিপুরের বার্মার সীমান্ত রেখার সেগুন বা রাজস্থান বা মহারাষ্ট্রের সেগুনের চেহারায় অনেকটাই তফাত। তবে আন্দামানের মওহা আমি নিজে দেখিনি। এই দ্বীপে নেই ও গাছ। আর আছে নানারকমের সফ্‌ট উড। তাদের মধ্যে সাদা ধূপ, বাকোটা, ডিডু। শিমুলেরই নাম এখানে ডিডু। পপিতা। লম্বাপাত্তি। লম্বা পাতাগুলো চমৎকার দেখতে। আমাদের উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে এই গাছ আছে। হাতিরা খুব ভালবেসে এই পাতাগুলো খায়। এছাড়াও আছে অর্নামেন্টাল উড।

গাছের কাঠও আবার অর্নামেন্টাল হয় নাকি?

—হয় বৈ কি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল এই যে আন্দামানে যতরকম অর্নামেন্টাল উড আছে তার প্রায় সবরকমই এই দ্বীপেও পাওয়া যায়। মানে, দ্যা স্যান্ড-পাইপার্স এ পাওয়া যায়। এন্ডেমিক।

তারপর বললাম, কাল সকালে দিনের আলোতে দেখিস, তুই যেখানে বসে আছিস তার বাঁদিকে একশ মিটার মতো ভিতরে একটি

রুপোলি ছাই-রঙা বড় গাছ আছে। তাদের কাণ্ডর একাংশর ওরকমই রং। রুপোর মতো। সেই গাছের নাম হচ্ছে সিলভার গ্রে। তারই ডানদিকে আরেকটি সফ্‌ট উড আছে তার নাম সাটিন উড। বড় মাছের তলপেটের মতো পেলব ও মসৃণ তার কাণ্ড। সাটিন উড গাছটা থেকে আরও পঞ্চাশ মিটার ভিতরে উত্তরে একটি গাছ দেখতে পাবি তার নাম মার্বল উড। তারই পাশে আরও একটি গাছ দেখতে পাবি তার নাম চুল।

সে কী রে!

হ্যাঁ রে। এটাও অর্নামেন্টাল উড। যদি বিশ্বাস না করিস তবে এদের বটানিকাল নামও বলে দিতে পারি।

—কী নাম?

—SAGERACA ELIPTICS

—কচি বলল, তুই মহারাষ্ট্রের কোনও নামকরা জঙ্গলে গেছিস?

—একমাত্র নাগজিরাতে গেছিলাম। আমার এক ফ্রেঞ্চ বান্ধবীর সঙ্গে। সে এসেছিল প্যারিস থেকে। প্রজাপতি দেখতে। সে ফ্রান্স-এর নামকরা Lepidopterist। শব্দটা অবশ্য ইংরেজি। মানে জানিস তো?

—না তো।

—লজ্জার কিছু নেই। অনেকেই জানেন না। প্রজাপতি বিশেষজ্ঞদের ঐ নাম।

—না, নাগজিরা নয়। আমি বলছি আন্ধারি তাড়োবার কথা। চন্দ্রপুরার কাছে।

—কী ঐ অভয়ারণ্যর নাম বললি যেন?

—আন্ধারি তাড়োবা। গান্ধারী গান্ধারী গন্ধ আছে না?

ওখানে একরকমের গাছ আছে, তার নাম ভূত-গাছ। যে গাছের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা আশ্চর্য সাদা। মনে হবে শ্বেতসেমের সাদা রং করে

দিয়েছে কেউ আপাদমস্তক। তবে গাছে যখন একটিও পাতা থাকে না তখনও ওরকম দেখায়। অন্য একটা নামও আছে। নাম KARU-GUM। আঠা সংগ্রহ করে ঐ গাছ থেকে মানুষ। ঐ গাছ যে-মানুষ কখনও আগে দেখেনি বা ঐ গাছ সম্বন্ধে শোনেনি, কৃষ্ণপক্ষের রাতে হঠাৎ দেখলে ভয় পেয়ে মূর্ছাও যেতে পারে। এদের বটানিকাল নামটাও বলতে পারি...

কচি বলল, নট ইন্টারেস্টেড। যা বললি তাই যথেষ্ট।

আমি মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ, মেলঘাট ইত্যাদি জায়গাতে গেছি। কিন্তু আন্ধারি তাড়োবাতে যাইনি।

পেঞ্চ-এও ঐ ভূত-গাছ কিছু আছে।

তারপর বললাম, মহারাষ্ট্রে গেলে আলাপল্লী গড়চিরোলিতেও যেতে পারিস যদিও নাগপুর থেকে অনেকই দূরে বড়ে। সেখানের জঙ্গলও দেখার মতো। আমি অবশ্য মহারাষ্ট্রের সব জঙ্গলে নাগপুর থেকেই গেছি আমার এক চেলা, প্রদীপ গাঙ্গুলির সঙ্গে।

কে সে?

নাগপুরের বেঙ্গলি সোসাইটির পাণ্ডা। পেশাতে এঞ্জিনিয়ার।

মহারাষ্ট্রের ফরেস্ট সার্ভিসের তরুণ আমলাদের আলাপল্লীতে পাঠানো হয় গাছ-গাছালি চেনার জন্যে। মেলঘাটেও পাঠানো হয়।

জিতেন কচির গ্লেনমোরান হুইস্কি আর আমার বোতলটি নিয়ে এল জল ও গ্লাসের সঙ্গে। বলল, সঙ্গে কিছু ভাইজ্যা দিমু স্যার?

—কী দিতে পারো?

কচি বলল।

একটু কুচো চিংড়ি ভাইজ্যা দি, কাঁচা লঙ্কা দিয়া।

কচি বলল, দাও।

বললাম, আজেবাজে জিনিস খাস না। খিদে নষ্ট হয়ে যাবে। রাতে অক্টোপাসের বাচ্চা ভাজা দিয়ে ভুনি খিচুড়ি রাঁধছে না জিতেন।

ঠিকই ত।

বলল, কচি। তারপর বলল, একটু নিয়ে এসো।

বললাম, একজনের জন্যে এনো। আমি কিন্তু হুইস্কির সঙ্গে খাব না কিছু।

যা বলেন ছার।

কচি বলল, কেন খাবি না? ডাক্তারের মানা?

—ডাক্তারের মানা শুনলে তো হুইস্কিও খাওয়া হত না আর এরকম ইচ্ছে মতো খাওয়ারও খাওয়া হত না। তাছাড়া, এখানে হার্ট-এ গুরুতর কিছু হলে তো খেল খতম। পোর্টব্লেয়ারে একজন বাঙালি ডাক্তার আছেন, তাঁর কাছে দুতিন মাসে একবার করে যাই। তবে সেখানে গেলেই তো সবকিছুতে না, না আর না। ডাক্তার তাঁর কর্তব্য করেন, আমার যা করার তাই করি। ডাক্তারদের সব কথা শুনলে তো এতদিন বাঁচাই হত না। যতদিন বাঁচার ততদিন এমনিতেই বাঁচব। জিতেনকে বলেছি যে, এখানেই মরলে আমাকে যেন একটি সিলভার আর্চ গাছের নীচে কবর দেয়। জিতেনের মতে, এখানে অনেক ভূত আছে। একজন ভূত বাড়বে তখন। এমন নির্জনে শুয়ে থাকার মতো আরাম আর কী আছে বল?

—তা যা বলেছিস। 'মাধুকরী'তে করিম সাহেবের কবর দেখতে গিয়ে পৃথুর যে শায়রীর কথা মনে পড়েছিল সেই শায়রীর কথাটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে আমার। এখানে 'তঁলকি পোড়োনা, লহদ্‌সে যাও, শান্তিতে ঘুমোতে দাও আমাকে।'

তা ছাড়া, বেশিদিন বেঁচে কী হবে বল? নিজের খুশি মতো না

বাঁচলে বেঁচে সুখ কী? আমার নামে তো কেউ জয়ধ্বনি দেবে না, আমার নামে রাস্তাও হবে না, ময়দানে স্ট্যাচুও হবে না। আমার বন্ধু হরিশংকর জালান বলত, দাদা, তুমি মরলে লোকে তোমাকে বা আমাকেও পনেরোদিনও মনে রাখবে না। খাও, পিও, মৌজ করো, যতদিন বাঁচো।

—তা ঠিক। বড় কবি বা চিত্রী, বা গায়ক না হলে কেউই আমাদের মনে রাখবে না। অমরত্বর লোভে বর্তমানকে মাটি করার মানেই হয় না।

—এরকম জায়গাতেই, নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই, নির্জনতার মধ্যেই মানুষের মনে নানা গভীর চিন্তার উন্মেষ হয়। তাছাড়া, বন্ধুদের মধ্যে আমার আগেই যারা চলে গেল তাদের অধিকাংশই পুতুপুতু করে বাঁচল। একমাত্র গোপাল ছাড়া কেউই বেপরোয়া হয়ে বাঁচেনি। নির্জনতাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। শান্তিনিকেতনে অন্ধ শিল্পী বিনোদবিহারী একজনকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'নির্জনতা কখনও খালি হাতে ফেরায় না।' রবীন্দ্রনাথ একবার একজনকে লিখেছিলেন, শ্রী অরবিন্দর কাছ থেকে ঘুরে এলাম। এবার ভাবছি আমিও সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকব। হাজার মানুষের হাজার ছোট ছোট দাবির শিলাবৃষ্টির আঘাতে জরজর হয়ে আছি। তা থেকে বাঁচার জন্যেই মৌনী থাকাটা দরকার।

তারপর বললাম, আমার জানা এক পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী, আচ্ছুরাম কালকাফফ্ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মোহন লাল ব্যাহাল প্রতি রবিবারে মৌনী থাকতেন। তিনি ছিলেন ভারতের সবচেয়ে বড় লাক্ষা ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক। রবিবারে কথা বলতেন না। অন্য কেউ ফোন ধরত, ফ্যাক্স রিসিভ করত। উনি তার মুখ থেকে শুনে কাগজে উত্তর লিখে দিতেন। তখন তো ই-মেইল ছিল না। অবশ্য থাকলেও উনি নিশ্চয়ই তা

দেখতেন না। ওসব মনকে বিভ্রান্ত করে দেয়। শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ কী সোহনলাল প্রত্যেকেই পরম ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। আমরা সবাই ছুটোছুটি করে প্রাণীহত্যা করে ছন্নমতি হয়ে গেছি। ঈশ্বর চিন্তা করার মতো ধীর স্থির মানসিকতা আমাদের আর হওয়ার উপায় নেই। তবে এখানে মাঝেমাঝে কবিতা লেখার আর ছবি আঁকার চেষ্টা করি। সেই সব কবিতা বা ছবি আদৌ কিছু হয় কি না জানি না কিন্তু তাতে বড় আনন্দ পাই।

কচি বলল, শোনা না দু একটা।

তা শোনাতে পারি। তুইই হবি সে সব কবিতার প্রথম শ্রোতা। কে ভাল বলল আর বলল না তা নিয়ে আমাব মাথা ব্যথা নেই।

তাহলে শোনা।

—এই গভীর অরণ্যময় পাহাড়ে বসে সমুদ্রধৌত পরিবেশে চাঁদ-নাচানো সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনে নানা ভাবনা আসে। এ সব তারই প্রভাব।

—আরে শোনাই না।

—দাঁড়া এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে নিই।

—খা। কিন্তু এবারে শোনা, আর গৌরচন্দ্রিকা করিস না।

সমুদ্রকে
সামান্য যে ছোট্ট সাদা পাখি,
তারও আছে মনের মানুষ কোনো,
তারও আছে ফাগুন দিনের ঘর।
আর তোমার?
তোমার শুধুই অনন্ত যৌবন,
তোমার শুধুই অনন্ত যন্ত্রণা,

লক্ষ হাতে বৃথাই খুঁজে মরা।

আপন হবে, এমন নেইকো কেউ
ফোঁসফোঁসানি সাঙ্গ করে তটে
নেতিয়ে পড়ে সাপের মতো ঢেউ।

শোনো শোনো নীল বারিধি শোনো
দিগদিগন্তে মেলে সুনীল কান,
সুখী যারা, তারা সবাই ছোটো,
আমার মতো মানুষ, কিংবা পাখি।

কচি বলল। বাঃ। বেশ লিখেছিস তো বুড়ো।

তা বটে। তবে শ্রোতা হিসেবেও তোর যেমন কোনও প্রতিষ্ঠা নেই, কবি হিসেবেও নেই আমার।

কচি হেসে বলল, সেটা ঠিকই বলেছিস। এবার আরেকটা শোনা।

আরও শুনবি? তবে শোন। এসব কবিতা তো কারোকেই শোনানো হয়নি। তুই-ই প্রথম শ্রোতা। শোন তবে। এই কবিতার নাম 'আছে'।

—আছে?

—হ্যাঁ। আছে।

'আছে, আছে, আছে।
সবই আছে।
ঝিনুকের বুকের ভিতরে মুক্তোর মতন,
জীবনের প্রথম সঙ্গমের সুখস্মৃতির মতন,
আমার নবতম প্রেমিকার ফুটি-না ফুটি
ফুলগন্ধী স্তনেরই মতন,
স্বপ্নে দেখা তার ফলসাবরণ শাড়ির মতন

অদেখা তার আগুনপারা নগ্নতার মতন,
সবই আছে।
বনে, বালুতটে, স্থলে,
আছে মৎস্যগন্ধী জলে,
মাছে,
আছে, আছে, আছে।
সবই আছে।"

বাঃ রে বুড়ো। কে বলবে তোর বয়স হয়েছে পঁচাত্তর।

—এই কবিতা তোর ভাল লেগেছে? কে বা বলবে তোর বয়স হয়েছে ছিয়াত্তর।

আমার কথাতে হেসে উঠল কচি। বলল, কে বা বলবে, তোর নাম বুড়ো।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরে কচি বলল, চল সমুদ্রে চান করে আসি। তুই যাবি তো? যাবি না? লোকে চানঘরে একা যায় চান করতে, একা গান গায় কিন্তু সমুদ্রস্নানে অনেকে মিলে যেতে হয়। এখানে 'অনেকে' যখন নেই, তখন তুই অন্তত যাবি তো?

কচি বলল, এখন যাবো না। সূর্য ঢলে পড়লে যাব। তারপর বলল, শুধু আমরা দুজনেই যাব?

—কেন? জিতেনকেও নিতে পারিস সঙ্গে।

—তা নিতে পারি কিন্তু কাঁকড়ার ঝাল আর কাঁকড়ার হাত-পায়ের চচ্চড়ি রাঁধবে কে তবে? খেতে বসে অন্যের রান্না করা খাবার খেতে আলাদা মজা। নিজে রান্না করার কষ্টের মধ্যেই খাওয়ার মজাটা মাটি হয়ে যায়।

—সেটা ঠিক। কিন্তু সকাল থেকে আকাশের অবস্থা দেখেছিস? একেবারে কালো। মনে হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে নামবে ঝাঁপিয়ে।

—ঝাঁপানো বৃষ্টির মধ্যে সমুদ্রে স্নান করার মজাটা যে কী দারুণ তা কজন জানে!

সেটা ঠিক।

তুই কস্ট্যুম এনেছিস?

না। বারমুডাস পরে চান করব, সাঁতার কাটব। তাছাড়া, থাকবি তো শুধু তুই-ই। কিছু না পরে জলে নামলেই বা কী?

—সে দৃশ্যটা কি খুব সুন্দর হবে?

—আদৌ হবে না। তারপর বলল, বিধাতার এই রসিকতার কোনও মানে বুঝি না। সব প্রজাতির পুরুষকেই তিনি সুন্দর করে গড়েছেন, বাঘ, সিংহ, হরিণ, সম্বর, ময়ূর, রাজহাঁস, পায়রা, চড়াই শুধু মানুষের বেলাতেই পুরুষকে অসুন্দর করে নারীকে সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছেন। এ ভারি অন্যায়।

তারপর বলল, তুই কী পরে চান করবি?

—আমিও বারমুডাজ পরেই চান করব।

—পায়জামা পরলে কেমন হত?

—কেমন হত তা তোকে বলতে পারি। ব্যাপারটা আদৌ সুখকর হত না।

তারপর বলল, অনেকদিন আগের কথা। গুড-ফ্রাইডের ছুটিতে একবার পুরীতে গেছি। বি এন আর হোটেলে উঠেছি। তখন পুরীতে তো অগণ্য ভাল-মন্দ হোটেল হয়নি। বি এন আরই সবচেয়ে ভাল হোটেল ছিল। আমর পাশের ঘরে সাহিত্যিক সমরেশ বসু ছিলেন আর তার পাশের ঘরে রুমা গুহঠাকুরতা আর অরূপ গুহঠাকুরতা, আর্টিস্ট এবং ফিল্ম ডিরেক্টর। সমরেশবাবু ধুতি পরতেন। সকলেই যখন চানে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন তখন সমরেশবাবু অরূপবাবুকে বললেন, অরূপবাবু, আমাকে সমুদ্র চান করার জন্যে একটি পাজামা ধার দেবেন?

উনি বললেন অবশ্যই দেব। তবে আমার পাজামা তো আপনার পক্ষে এক ফুট মতো লম্বা হবে। তাতে কি চলবে?

—খুব চলবে। নিচটা গুটিয়ে নেব তাহলেই হবে।

একটু পুরে অরূপবাবু একট পাজামা এনে সমরেশবাবুকে দিলেন। অরূপবাবু সুইমিং ট্রাঙ্ক নিয়ে এসেছিলেন। আমিও নিয়ে গেছিলাম। বি এন আর-এর আলাদা বিচ ছিল। হোটেল থেকে সিমেন্ট বাঁধানো পথ চলে গেছিল তট অবধি। সেখানে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ রঙা ছাতা পোঁতা ছিল। গোল টেবলের মধ্যিখান ফুঁড়ে সেইসব ছাতা উঠেছিল। রঙিন ত্রিপলের ঘের দেওয়া চেঞ্জ রুমও ছিল। পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে আলাদা আলাদা।

আমরা সবাই চেঞ্জ করে জমে নামলাম।

তারপরে বলল, এখানে একটা কথা বলব তোকে। দেশে যত সমুদ্রতট আছে সমস্তকটিই আমার দেখা। পুরী, কোভালাম, গোয়া, গোপালপুর, ভাইজাগ, দীঘা, মুম্বাই ও চেন্নাই। তবে শেষের দুটি বীচ হিসেবে ভাল নয়। এবারে তোর দয়াতে দেখলাম আন্দামান। কিন্তু চান করতে পুরীতে যে মজা তা আর কোথাও নেই।

আমি বললাম, আন্দামানের অধিকাংশ দ্বীপের তটভূমিও স্নানের যোগ্য নয়, সমুদ্রর উপরে পাহাড় যেন সোজা নেমে এসেছে এবং প্রথমেই গভীর জল। সেই তুলনাতে আমাদের এই স্যান্ডপাইপারের তটভূমি আয়তনে ছোট হলেও বেশ ভাল। পোর্টব্লেয়ার শহরে এক প্রান্তে পিয়ারলেস হোটেলের সামনে কিছুটা তটভূমি আছে আর আছে চিড়িয়াটাপ্পুর নীচে। কিন্তু সে তটভূমি কেমন যেন নোংরা। তবে ছোট হলেও সুন্দর তটভূমি আছে সিঙ্ক আইল্যান্ডে।

—সিঙ্ক? অদ্ভুত নাম তো।

—হ্যাঁ। ফ্রেঞ্চ নাম। বানান হচ্ছে Cinque। মানে হচ্ছে, পাঁচ।

পাঁচটি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ। জলিবয় আইল্যান্ডেও ছোট হলেও সুন্দর তটভূমি আছে।

ভাটার সময়ে সিঙ্ক আইল্যান্ডে একটি দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে হেঁটে যাওয়া যায়—জল তখন এত কমে যায়। আর স্বচ্ছ জল। বালির উপর দিয়ে হাঁটতে তখন কী মজা। ওটি একটি ম্যারিন স্যাংচুয়ারি। কী সুন্দর যে সব প্রবাল আছে সেখানে। প্রবাল প্রাচীর। কত রকমের মাছ, কত রঙা শ্যাওলা, অ্যালগি, ফাঙ্গি, প্ল্যাংকটন। জলিবয় আইল্যান্ডের বালিতে পোঁতা কাঠের দণ্ডর উপরে বোর্ডে লেখা আছে, "Leave only your footprints behind"— তার মানে, কোনও কিছু তটে ফেলে যেও না, খাবারের প্যাকেট, কোক-এর টিন, বিয়ারের বোতল ইত্যাদি। আমাদের দেশের বয়স্ক মানুষদেরও ক্রমান্বয়ে এইসব প্রাথমিক সহবৎ শেখাতে হয়—তাও কি শিখি আমরা? এখানে প্রবালও দেখা যায়। গ্লাস-বটম ডিঙ্গি নৌকো থেকে। তবে তাদের যা ছিরি, মানে সেই সব বোটের।

কচি বলল, আমেরিকার হাওয়াইআন আইল্যান্ডস্-এর প্রশান্ত মহাসাগরের ওয়াইকিকি এবং অন্যান্য দ্বীপে বিরাট বিরাট ছোট বোট-এ, মানে গ্লাস-বটম জাহাজে, সান-সেট পার্টিও হয়। খানা-পিনা-নাচা-গানা আর সেই স্বচ্ছ কাচ দিয়ে দেখা যায় নীচে ছোট বড় নানা মাছ, হাঙ্গর, অক্টোপাস ছোট তিমি। আর প্রবালদের যে কত রকম রং! তবে প্রবালই যদি দেখতে চাস তবে তোকে যেতে হবে সেশেলস্ আইল্যান্ডস্-এ। একবার অবশ্যই ঘুরে আসিস। সারা পৃথিবীর জলদস্যুদের আস্তানা ছিল সেখানে। ডাচ, স্প্যানিশ, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ আরও কত দেশের। তাদের গুপ্তধন এখনও পোঁতা আছে বিভিন্ন জায়গাতে। সেশেলস্ আইল্যান্ডস্-এর রাজধানী ভিক্টোরিয়ার 'বোভাঁলো' বলে একটি জায়গাতে এখনও গুপ্তধনের সন্ধানে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। এই দ্বীপপুঞ্জ

যে কত ছোট তার প্রমাণ এই ভিক্টোরিয়া মাহে দ্বীপের উপরে। আর মাহে দ্বীপের সাইজ হচ্ছে আঠারো বাই তিন মাইল—এই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ছোট ছোট প্লেন-এ করে অথবা বোটে করেও যাওয়া যায়।

আমি বললাম, কচিরে! সবই ত বুঝলাম। ওদিকে সাহিত্যিক সমরেশ বসুকে যে পায়জামা গুটিয়ে পুরীর সমুদ্রে চান করার জন্য দাঁড় করিয়ে রেখে এলি—তাঁর কী যে হলো বলবি তো।

বুড়ো ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, সত্যি। খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। হ্যাঁ পুরীতেই ফিরি। পুরীর মতো চান করে আরাম পৃথিবীর খুব কম সমুদ্রতটেই আছে কিন্তু। এ কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

—সমরেশবাবুর কথা বল।

—সমরেশবাবু, অপরূপবাবু সকলেই নুলিয়া নিয়েছিলেন। আমি নিইনি। তখন বয়স অনেক কম ছিল, তাছাড়া, সাঁতারাটাও খারাপ কাটতাম না।

তারপর?

—কিছুক্ষণ ঢেউয়ের সঙ্গে নাচানাচি করার পরেই বুঝলাম কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তারপর বোঝা গেল যে গোলমালটা সমরেশবাবুকে নিয়েই। ঢেউয়ের উত্থান পতনে অরূপবাবুর গোটানো পায়জামা খুলতে খুলতে পুরোটা খুলে গেছে।

তারপর বলল, মানেটা বুঝলি তো! ওপর দিকটা পেটে টাইট করে বাঁধাই ছিল। সে বাঁধনের কিছুই হয়নি কিন্তু হাঁটু অবধি গোটানো পাজামাটা এক এক ঢেউয়ে দু তিন ইঞ্চি করে নামতে নামতে পুরোটাই নেমে গেছে এবং লম্বা মানুষের পায়জামা বেঁটে মানুষ পরলে যায় হয় আর কী! পায়ের নিচে পায়জামা লটর-পটর শুরু করতেই নুলিয়ার আপ্রাণ সাধু চেষ্টা সত্ত্বেও পায়জামাতে পা জড়িয়ে যাওয়াতে

সমরেশবাবু বারংবার ধাঁই-ধপাধপ করে বালিতে আছাড় খেতে লাগলেন। স্যুইম-স্যুট পরা অসংখ্য তরুণীদের সামনে। অত বড় সাহিত্যিকের কপালে যে অতবড় হেনস্থা লেখা ছিল তা কে ভেবেছিল? তার কিছুদিন আগেই তাঁর লেখা 'বিকেলে ভোরের ফুল' ছবি হয়েছে। নায়ক উত্তমকুমার।

আমরা, মানে, অরূপবাবু এবং আমি স্নানরতা অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষেরা অসহায়ের মতো তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তাতে তাঁর কষ্টটা তীব্রতর হল।

আমাদের সম্মিলিত অনুরোধ উনি কোনোক্রমে নুলিয়ার হাত ধরে জল ছেড়ে উঠলেন এবং চেয়ারে বসে খুলে যাওয়া পায়জামা আবার গুটিয়ে নিয়ে তোয়ালে জড়িয়ে হোটেলে ফিরে গেলেন। তারপর দুদিন আর সমরেশবাবুকে দোতলার বারান্দাতে, ডাইনিং রুমে অথবা হোটেলের সামনের বাঁধানো জায়গাটিতে পায়চারি করতেও দেখা গেল না। শরীরে এতই ব্যথা হয়েছিল এবং শরীরের এত জায়গা বড়দানার বালির উপরে ঢেউ-এর বারংবার রদ্দাতে ছুলে গেছিল যে, সে কথা বলার নয়।

পরদিন ওঁকে দেখতে যেতে কষ্টেসৃষ্টে বললেন, অরূপবাবু প্রথমেই মানা করেছিলেন। না শোনাতেই এই অবস্থা। দিনে চারটে করে পেইনকিলার খেয়েও ব্যথা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি যে কলকাতা পালাব তারও উপায় নেই। সিজনের সময় টিকিটও নেই। না পুরী থেকে না ভুবনেশ্বর থেকে। প্লেনেও। অসহায়ের মতো বললেন সমরেশবাবু।

তারপর থেকে কারোকে অন্যের পায়জামা পরে সমুদ্রে নামতে দেখলেই আমি যতরকম ভাবে পারি তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি।

আমরা প্রায় নেমে এসেছি স্যান্ডপাইপারের ছোট্ট তটভূমিতে। আর সামান্যই নামতে হবে আমাদের। আকাশের কালো এখন ঘনতর হয়েছে। পাহাড়ের যে জায়গাতে এসে আমরা পৌঁছেছি, সে জায়গাটা পরিষ্কার এবং প্রায় সমতল দেখে কচি বলল, এই জায়গাটাতে লেভেলিং করা হয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন?

বললাম, শুধু এখানেই নয়, এই দ্বীপের আরও আটদশটি জায়গাতে আমরা ডায়াস্কোরিয়ার চাষ শুরু করেছি।

—সেটা আবার কী বস্তু?

—ডায়াস্কোরিয়া দিয়ে গর্ভনিরোধক বড়ি তৈরি হয়। আসলে চিনদেশে এর পরিচিতি বহুদিনের। শোনা যায় যে চিনের দেহপসারিণীরা বহু যুগ থেকে ডায়াস্কোরিয়া নিয়মিত খেত গর্ভাধান এড়াবার জন্য। এখন অন্যান্য দেশে, যেমন আমাদের দেশেও এ দিয়ে গর্ভনিরোধক বড়ি তৈরি হয়। বড় বড় ওষুধ কোম্পানিকে আমরা ডায়াস্কোরিয়া পাঠাই। ওজনেও নারকোলের চেয়ে অনেকই হালকা আর দামেও অনেক ভারী।

—কাদের পাঠাস?

—যেমন কলকাতার দেজ মেডিক্যাল, মুম্বাই-এর সিপলা, চেন্নাই-এর প্যারী কোম্পানি। ধীরে ধীরে আরও অনেকখানি জমিতে এই চাষ করব। বীজ বোনার সময়ে আর প্রডাক্ট হারভেস্ট করার সময়ে কিছু লেবারের দরকার হয়। তারপরে বোটে করে পোর্টব্লেয়ার। ওখানে আমাদের এজেন্ট আছে। তারাই পরিষ্কার করে, ড্রেসিং করে, জাহাজে বা কোনও সময়ে প্লেনেও বুক করে কলকাতা পাঠায়। সেখান থেকে মুম্বাই। চেন্নাই-এর কনসাইনমেন্ট পোর্টব্লেয়ার থেকে সরাসরি চলে যায় চেন্নাই।

তটে যখন আমরা নেমে এলাম তখন এমনই অন্ধকার করে এল যে মনে হল সূর্যের পূর্ণ গ্রাস হয়েছে।

—কিউমুলো নিম্বাস।

কচি বলল।

তারপর বলল, এক রকমের মেঘ হয় তাদের নাম নিম্বাস। এই নিম্বাসই যখন পুঞ্জীভূত হয় তখন তাদের বলে কিউমুলো নিম্বাস। ঘন কালো জলবাহী মেঘপুঞ্জের এই নাম।

—তুই এত জানলি কী করে?

আমার এক মারাঠী পাইলট বন্ধু ছিল কাশবেকার। আমি নাগপুরে থাকার সময়ে বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিছুদিন আগে হাইওয়েতে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় নভেগাঁও-এর কাছে। কাশবেকার যখন গাড়ি চালাত ও ভুলে যেত যে প্লেন চালাচ্ছে না। ওর কাছ থেকেই শিখেছিলাম এসব। সব পাইলটদেরই না কি এই মেঘতত্ত্ব জানতে হয়। মহাকবি কালিদাস হয়তো পাইলট ছিলেন। নইলে, মেঘের হাত দিয়ে প্রেমিকাকে চিঠি পাঠাতেন কেমন করে?

কচি বলল।

তারপরই বলল, তুই কখনও খিন্দসিতে গেছিস?

—খিন্দসি। সেটা আবার কোথায়?

—মহারাষ্ট্রেই। নাগপুর থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানে ভারি সুন্দর একটি হ্রদ আছে। তার নামই খিন্দসি। হ্রদের নামে নাম। একটি ট্যুরিস্ট স্পট। মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম-এর কয়েকটি বাংলো আছে হ্রদের পাশে, টিলার উপরে। সবচেয়ে ভালো দুটি বাংলো টিলার মাথায়। সেখানেকার ঘরে বসে সারাদিন নীল হ্রদের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। খিন্দসির কাছে আছে রামটেক। সেখানেই বসে নাকি কবি কালিদাস

মেঘদূত লিখেছিলেন। মেঘদূত লেখার মতো জায়গাই বটে। পাহাড়ের উপরে বসে সারাদিন মেঘের আনাগোনা দেখা যায়। রামটেকেই ভারতের প্রথম সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় বেশ কিছুদিন আগে। রামটেক একটি আলাদা হ্রদ। তার পাশে পাহাড়। তার উপরে রামমন্দির ছাড়াও অন্য নানা মন্দির আছে। তবে রামটেক হ্রদটি ছোট—খিন্দসির মতো এত বড় নয়।

আমি বললাম, হ্রদ তো একটি আন্ধারি তাড়োবা জঙ্গলেও আছে। সুন্দর হ্রদ।

—তা বটে। কিন্তু খিন্দসির সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়। যাস একবার অবশ্যই।

—জীবনের ত বেশি বাকি নেই আর। সব জায়গাতে যাবার সময় আর নেই। সব জায়গাতে যাওয়াও সম্ভবও নয়।

কচি বলল, তোর মুখে নেই, নেই মানায় না। যে লিখতে পারে, "আছে। আছে। আছে।

সবই আছে।
ঝিনুকের বুকের ভিতরে মুক্তোর মতন,
জীবনের প্রথম সঙ্গমের সুখস্মৃতির মতন
আমার নবতম প্রেমিকার ফুটি-না-ফুটি
ফুলগন্ধী স্তনেরই মতন,
স্বপ্নে দেখা তার ফলসাবরণ শাড়ির মতন,
অদেখা তার আগুনপরা নগ্নতার মতন
সবই আছে।
বনে, বালুতটে, স্থলে
আছে মৎস্যগন্ধী জলে,

মাছে,

আছে, আছে, আছে

সবই আছে।"

তারপর কচি বলল, বেড়ে লিখেছিস রে বুড়ো।

—ছাড়। এবারে মেঘের কথা বল। জলে নামার আগে আর একটু মেঘের কথা শুনি।

—আমি আর কতটুকু জানি। কাশবেকারের কাছে যতটুকু শিখেছিলাম, ততটুকুই।

—আঃ বল না কচি।

—পাৎলা পাৎলা পেঁজা তুলোর মতো ঊর্ধ্বমুখী সাদা মেঘকে বলে সাইরাস, ইংরেজি Cirus। সঠিক উচ্চারণটা কী জানি না। কাশবেকার সাইরাসই বলত। তাদেরই যখন ছানার ডালনার কাটা ছানার মতো দেখায়, তখন তাদের বলে, সাইরো-কিউমুলস। সাইরো যখন সমান্তরাল গড়নে দেখা যায়, তখন তাদের নাম হয়ে যায়, সাইরো স্ট্রাটাস। যখন পুঞ্জীভূত হয়, তখন তা হয়ে যায় কিউম্যুলাস স্ট্র্যাটো কিউম্যুলাস। স্ট্র্যাটাসকে খুব কালো যখন দেখায়, এখন যেমন দেখাচ্ছে আর কী, তখন তাদের বলে আলটো-স্ট্র্যাটাস। স্ট্র্যাটাস মেঘেরা থাকে সবচেয়ে নীচে, মনে কর, পনেরোশো-ষোলোশ ফিট-এ। তার উপরে ছ'হাজার ফিট অবধি দেখা যায় অন্যদের। হাজার থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ফিট অবধি দেখা যায় আলটো কিউম্যুলাস, কিউমুলো নিম্বাস, আলটো স্ট্র্যাটাস এবং সাইরো-স্ট্র্যাটাসদের। তারও উপরে চল্লিশ হাজার ফিট অবধি দেখা যায় যে মেঘ তার নাম সাইরাস। এবং সাইরো কিউম্যুলাসদের। চল্লিশ হাজার ফিটের উপরে, জেট প্লেনগুলো সাধারণত চল্লিশ হাজার ফিটের উপর দিয়েই যায়, দিনের বেলা তখন

জানালা দিয়ে দেখলে দেখা যায় বহুরঙা রামধনুর মতো স্বপ্নময় কিন্তু সমান্তরাল মেঘপুঞ্জ, তুই নিশ্চয়ই দেখেছিস, সেই মেঘেদের বলে ইরিডিসেন্ট ক্লাউডস্। তারও উপরে কী মেঘ আছে তা জেনে আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই বলেই কাশবেকারের কাছ থেকে জানিওনি।

চল, এবারে জলে নামি।

কচি বলল।

একেবারে ঘোর অন্ধকার যে রে। নিজের হাত-পাই দেখতে পাচ্ছি না।

এমন সময়ে একটা তীব্র আলোর ঝলকানি দেখা গেল পাহাড়ে। আলোটা নাচতে নাচতে দ্বীপের উপর থেকে তটের দিকে আসছে উঁচু নিচু জমি বেয়ে।

ওটা কী রে?

কচি বলল। ভৌতিক ব্যাপার নাকি?

বললাম, নিশ্চয়ই জিতেন। জিতেন বলে, এখানে অনেক রকম ভূত আছে। দাঁড়া, ও কেন এমন করে দৌড়ে আসছে জানা যাক আগে।

কিছুক্ষণ থেকে খুব জোরে বাতাস বইছিল। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল তটে। দ্বীপের গাছপালা সব উথালি-পাথালি হচ্ছিল। হাওয়াটাও ক্রমশ জোর হচ্ছিল। সমুদ্রের উপর থেকে সোঁ সোঁ করে আওয়াজ উঠছিল একটা।

আলোটা পাহাড় ছেড়ে তটে নেমে এল। জিতেনের গলা শোনা গেল এবারে ঐ দামাল হাওয়ার মধ্যে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চটার আলো এদিক ওদিক হচ্ছে তটে আমাদের অবস্থান জানার জন্যে।

জিতেন এবারে চেঁচাল, ছার। আপনারা কোথায়?

আমি বললাম, আমরা এখানে। কেন? কী হয়েছে?

জিতেন আমাদের কাছে এসে বলল, রেডিওতে কইল খুব ঝড় আইতাছে। সমুদ্রে হক্কলডিকেই যাইতে বারণ করতাছে।

—সুনামি-টুনামি নাম বলেছে কিছু?

—না, তা বলে নাই। তবে ভীষণই ঝড়। আগে থাকতে বোঝন যায় নাই। চলেন চলেন আর সমুদ্রে চান কইরা কাম নাই।

তারপর বলল, আপনারা টর্চটা লইয়া যান। আমি একবার বোট দুইখানকে দেইখ্যা যাই। দড়ি-দড়া বান্ধা-বান্ধি ঠিক আছে কি নাই? ঢাকনগুলার রশিও ঠিক ঠিক আছে কি নাই? কী হইব কে জানে। বোটগুলান ভাইস্যা গেলেই তো কম্ম ফতে হইবনে। আবার কি সুনামি আইব?

ঐ টেনশনের মধ্যেই কচি বলল, আজকে রাঁধছ কী? তুমি খিচুড়ি করছ তো?

—মেনু, আপনে যা কইয়া দিচ্ছেন তাই রাঁধতাছি স্যার। সে জন্যে কুনো চিন্তা নাই। আপনেরা এখন সাবধানে উইঠ্যা যান।

—তুমি অন্ধকারে আসবে কী করে! চলো আমরা একসঙ্গেই যাব। দড়িদড়া বাঁধতে আমরাও তো কাজে লাগতে পারি। হাওয়ার তেজ তো ক্রমেই বাড়ছে দেখি।

—হ্যাঁ স্যার। সেই লিগ্গাইত দৌড়াইয়া আইলাম।

বড় বোট ও ক্যাটাম্যারনের দড়ি-দড়া সব ঠিক-ঠাক আছে কি না দেখে আমরা তিনজনেই পাহাড়ে চড়তে লাগলাম। দুটো বোটই একটা মস্ত গর্জন গাছের সঙ্গে ভাল করে বাঁধা ছিল। এখন ঝড়ে যদি গর্জন গাছটাকেই উপড়ে দেয় তবে অন্য কথা। নইলে, বোট হেঁটে যাবে এমন ভয় নেই।

কিছু দূর উঠেছি প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে এমন সময়ে কালপেঁচা দুড়গুম দুরগুম করে বুক কাঁপিয়ে ডেকে উঠল। এগুলো আন্দামানি পেঁচা। যারা আগে এই পেঁচার ডাক শোনেনি, তারা শুনলে সত্যিই আঁতকে উঠবে। ওড়িশার সিমলিপালের ধুধুরুচম্পার জঙ্গলে আমি একবার মাত্র শুনেছিলাম।

কচি বলল, এটা কী রে। একটু হলে তো হার্ট-ফেল করে মরছিলাম।

—সেইরকমই ব্যাপার বটে। একজোড়া আছে এখানে। একটা প্যাডক গাছে থাকে ওরা। প্রকাণ্ড বড় হয় আর সেই জন্যেই গলাতে এমন জোর। কিন্তু ডাকাডাকি খুবই কম করে। অন্য জায়গার পেঁচা-পেঁচানি যেমন সন্ধে হলেই ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে ঝগড়া করে এরা তা করে না। খুব প্রেম দুজনের মধ্যে।

একবার চেহারাটা দেখা গেলে হত।

কাল সকালে যদি দুর্যোগ কেটে যায়, তখন দেখিস। আমার কাছে দূরবীন আছে তা দিয়ে। কপালে থাকলে, দেখতেও পারিস।

—দেখব চেষ্টা করে। এখন দুর্যোগ কখন কাটে, দেখা যাক।

একেবারে ভিজে চুপচুপে হয়ে ফিরলাম কচি এবং আমি। সমুদ্র স্নান তো হল না, বৃষ্টিতেই চান হল। শাওয়ারে চান করে শুকনো জামা-কাপড় পরে কচির আনা কনিয়াক খেলাম আমরা ঈষোদোষ্ণ গরম জল দিয়ে।

—তুই তো দেখছি সঙ্গে বার নিয়ে এসেছিস। আনিসনি কী?

—সবই এনেছি। শহরে ত আসিনি যে যা ইচ্ছা করবে তাই পাব। বয়স তো হয়েছে রে বাবা। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর-জারি হলে? ব্র্যান্ডির পরে ভুনি খিচুড়ি খেলে কোনও রোগ তাকে স্পর্শ করবে সেটা হচ্ছে না। তা ছাড়া, এই তো আমার বেলাশেষের গান।

—আমি চুপ করে রইলাম।

আড়াই-তিন ঘণ্টা তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হবার পরে হঠাৎই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। এমনকী, রাত চাঁদভাসিও হল। আমরা বাইরে চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসলাম।

এমন জঙ্গল অথচ কোনও মাংসাশী শ্বাপদ নেই—মোস্ট

আনইন্টারেস্টিং। ভাবা যায় না। এ জঙ্গলে কোনো ভয় নেই, রহস্য নেই, জঙ্গল বলে মনেই হয় না।

কচি বলল।

জিতেন খিচুড়ি চাপিয়েছে। ভাজা মুগডালের গন্ধ উড়ছে রাতের স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে। ওকে ডেকে বললাম। বাদাম আর কিসমিস দিচ্ছো তো জিতেন?

—দিছি ছার।

—ঘি আছে তো? তোমার গোয়ালাদের দ্বীপ থেকে বেশি করে গাওয়া ঘি নিয়ে এসো।

কচি বলল, ঘি-এর এই সুবিধা। মাখন তো ফ্রিজ ছাড়া রাখা যায় না।

জিতেন বলল, যখন কষব খিচুড়ি তখনও বেশি কইর‍্যা দিমু আবার খাওয়ার সময় গরম গরম পাতেও দিমু।

কচি বলল, ভারি সুন্দর গন্ধ ছেড়েছে রে। ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্।

আমি কিছু বললাম না।

কচি বলল, কী রে বুড়ো, আজ তোকে একটু অফফ-মুড দেখছি কেন সন্ধে থেকেই।

—মাঝে মাঝে এমন হয় রে আজকাল। তুই যখন দুপুরে ঘুমোচ্ছিলি...

—ওই বয়সে দুপুরে একটু ঘুমোনো ভাল। সারা জীবন কি টগবগে ওয়েলার ঘোড়ার মতো বাঁচা যায়।

—তুই তো সেরকমই বাঁচছিস।

—ঘুমুবি, ঘুমুবি, সময় পেলেই ঘুমুবি।

কচি বলল।

—এবারে তো চিরঘুম। ঘুমই ঘুম।

—তারপর বললাম, আজকাল কী হয় জানিস? একা থাকলেই হঠাৎ গোপাল, কী সুব্রত, কী এ বি কাকু, নাজিম সাহেব পেছন থেকে ডেকে বলে ওঠে বা ওঠেন : কী করছ বুড়ো? চলে এসো। তুমি নইলে জমছে না।

—তাই?

—হ্যাঁ রে। এখানে আর কতদিন থাকতে পারব জানি না। তার উপরে জিতেনের সব সময়ে ভূত-প্রেতের নানা কাহিনি।

কী ভূত?

কত ভূত আছে। একবার ওকে একা ডেকে জিগ্যেস করিস না। ওর উৎসমুখ খুলে গেলে আর দেখতে হবে না। জলের দেবতারা, অশান্ডিমারু, মুত্তেলামা, টোটম্মা। ঝড়ের দেবতার নাম পুলুগা, উলুগারই আরেক নাম বলতে পারিস। আর আছে জুরাইন—বড় সর্বনাশা দেবতা। তার বাসও জলে।

মুত্তেলামা—টোটম্মা, অশান্ডিমারু এসব তো তেলুগু জেলেদের দেবতা। গোপালপুর-অন-সীতে এপ্রিল মাসে একবার ওদের উৎসবের সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। সেইসব দেবতাদের মূর্তি নিয়ে ওরা শোভাযাত্রা করে ঘুরছিল। আমাদের একচালা দুর্গাপ্রতিমার মুখে যেমন গর্জন তেল মাখানো হত আগে ওঁদের মুখেও তেমন গর্জন তেল মাখানো ছিল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গেছিলাম। হ্যাজাকের আলোতে দেখা সেই শোভাযাত্রা, রং-চং-এ শাড়ি পরা লাল-ভেটকির দেশের কুচকুচে কালো প্রাণবন্ত তেলুগু জেলেনিরা এখনও চোখে ভাসে।

—হতেও পারে। জিতেনের অনেক তেলুগু ও তামিল জেলে বন্ধু আছে।

—তাই?

—চলে যাওয়ার বন্ধুদের কথা তো মনে পড়েই তার উপরে সমুদ্রের অতল জলের আহ্বানও শুনতে পাই। সেখানে টাইগার শার্ক, সিয়ার, সার্ডিনের ঝাঁককে তাড়া করে মাছেদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বগারী পাখির ঝাঁকেরা বন্দুকের গুলির শব্দে যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তেমন করে মাছেরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে জলের নীচে যে লাল প্রবালের প্রাসাদ আছে, যার চারপাশে হালকা সবুজ শ্যাওলার দেওয়াল, নানারকম অ্যালগি, প্ল্যাংটন, ফাঙ্গি সেই দরজা দিয়ে ঢুকে প্রবাল-প্রাসাদে অদৃশ্য হয়ে যায়। টাইগার শার্কটা আমাকে তাড়া করে, আমি খুব জোরে সাঁতার কেটে বাঁচার চেষ্টা করি কিন্তু টাইগার শার্ক-এর অগণ্য দাঁতে সে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তখন আমার খুব ভয় করে, মৃত্যুভয়।

—দূর শালা। আরেকটা ব্রান্ডি খা।

—মাঝে মাঝে মনে হয়, বিয়ে তো করলাম না। কেন যে করলাম না, তাও ভেবে পাই না। ছেলেমেয়েও নেই। আমার শ্রাদ্ধ করবে কে? আমার আত্মার কি মুক্তি হবে না? আন্দামান উপমহাসাগরের এই দ্বীপে আমার আত্মা কি ভূত হয়ে থাকবে?

—দূর শালা! বিয়ে করিসনি, বেঁচে গেছিস। আজকাল আবার কারো শ্রাদ্ধ হয় নাকি? ব্রাহ্মমতে উপাসনা করবি। আমরা সব তোর স্মৃতিচারণ করব। অবশ্য আমি যদি তোর অগেই ফওত না হয়ে যাই। তুই যে এতবড় নার্সিসিস্ট তা তো আগে জানিনি। মরতে তো হবেই আজ আর কাল। তা নিয়ে এত ভ্যান্তারা কিসের? সময় হলে তোর এই আন্দামানি পেঁচার ডাকের মতো দুরুগুম শব্দ করে একসময়ে ফুটে যাবি।

—তুইও তো হিন্দু। তুই মরলে শ্রাদ্ধ হবে না?

—জীবদ্দশাতেই যত লোকে আমার শ্রাদ্ধ করল আজ পর্যন্ত আর শ্রাদ্ধর দরকার নেই। কী হবে না হবে আমি তা কি দেখতে আসব?

তারপরেই কচি বলল, তুই তো রবীন্দ্রসংগীত খুব ভালবাসিস। এই গানটা শুনেছিস কখনও?

—কোন গানটা?

—"না হয় তোমার যা হয়েছে তাই হল।
আরও কিছু নাই হল, নাই হল, নাই হল।

চলবে সোজা বীণার তারে ঘা দিয়ে
ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে।
হারিয়ে চলিস পিছনেরে, সামনে যা পাস কুড়িয়ে নে রে—
খেদ কী রে তোর যাই হল।।
না হয় তোমার যা হয়েছে তাই হল।"